মাল্যবান

জীবনানন্দ দাশ

[Malyaban, a novel by poet Jibanananda Das]

সারাদিন মাল্যবানের মনেও ছিল না; কিন্তু রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে মনে হল বেয়াল্লিশ বছর আগে ঠিক এইদিনেই সে জন্মেছিল–বিশে অঘ্রাণ আজ।

জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর তা হলে চলে গেল।

রাত প্রায় একটা। কলকাতার শহরে বেশ শীত, খেয়ে–দেয়ে কম্বলের নীচে গিয়েছে সে প্রায় গোটা দশেকের সময়; এতক্ষণে ঘুম আসা উচিত ছিল, কিন্তু এল না; মাঝে-মাঝে কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। কলেজ স্ট্রিটের বড় রাস্তার পাশেই মাল্যবানের এই দোতালা ভাড়াটে বাগিড়টুকু; বাড়িটা দেখতে মন্দ নয়–কিন্তু খুব বড়–সড় নয়–পরিসর নেহাত কমও নয়। ওপরে চারটে ঘর আছে–তিনটে ঘরেই অন্য ভাড়াটে পরিবার থাকে–চিক দিয়ে ঘেরাও নিজেদের জন্যে তারা একটা আলাদা ব্লক তৈরি করে নিয়েছে–নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট–এ দিককার খবর বড় একটা রাখতে যায় না।

ওপরের বাকি ঘরটি মাল্যবানদের স্ত্রী উৎপলা ঘরটিকে গুছিয়ে এমন সুন্দর করে রেখেছে যে দেখলে ভাল লাগে। ধবধবে দেওয়ালে গোটা কয়েক ছবি টাঙানো; একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট; প্রৌঢ়ের, উৎপলার বাবার হয়ত, তার মা–র একটা অয়েলপেন্টিং; মাল্যবানের শ্বশুর পরিবারের আরো কয়েকটি লোকের ফটোগ্রাফ–কয়েকটা হাতে–আঁকা ছবি। (কে এঁকেছে?)–ঘরের ভেতর একটা পালিশ মেহগনি কাঠের খাট, খাটের পুরু গদির ওপর তোশকে বকপালকের মতো শাদা বিছানার চাদর সব সময়েই ছড়িয়ে আছে। দুজন মানুষ এই বিছানায় শোয়; উৎপলা (তাকে ‘পলা’ ডাকে তার সমবয়সীরা আর বড়রা প্রায় সকলেই) আর তার মেয়ে মনু। মেয়েটির বয়স প্রায় নয় বছর। মাল্যবান ও উৎপলার এই বার বছরের দাম্পত্য–জীবনের মধ্যে এই একটি মেয়েই হয়েছে। কোনোদিন আর–কিছু হবে না যে তাও ঠিক।

দোতলার এই ঘরটা বেশ বড়, মেঝে সব সময়েই ঝরঝরে; এক টুকরো কাগজ, ফিতে, সেফটিপিন, পাউডারের গুঁড়ি পড়ে থাকে না কখনো; ঘরের ভেতর টেবিল চেয়ার সোফা কৌচ রয়েছে কতকগুলো; সবই বেশ পরিপাটি নয়, ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু উৎপলার যত্নের গুণে খারাপ দেখাচ্ছে না। এক কোণে একটা অর্গ্যান রয়েছে; তারই পাশে একটা সেতার আর একটা এস্রাজ; উৎপলার আলোর জিনিস; গাইতে ভালবাসে, বাজাবারও সাধ খুব, প্রায় গুন গুন করে সব সকর্মতার ভেতর কোনো-না–কোনো একটা সুর ভাঁজছে, মাঝে-মাঝে কীর্তনের সুরও; এক-এক সময়, বিশেষত বাথরুমে ধারাস্নানের সময়, বেশ জোরে গান গায় পলা। গান-টান মাল্যবান কিছুই জানে না, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব সহিষ্ণুভাবে স্ত্রীর ষড়্জ ঋষভ গান্ধার-টান্ধার সহ্য করে যাওয়াই তার অভ্যাস, না হলে তা হয়ে উঠবে দুষ্ট সরস্বতী, তখন রক্ষা থাকবে না আর। কিন্তু তবুও বড় একঘেয়ে লাগে তার, স্ত্রীর গান বলেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত গান-বাজনার ওপর অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তার মন; কী করবে যে সে কিছুই ঠিক পায় না। মুখ চুন করবে, সঙ্গে-সঙ্গেই কান ঝাঁ ঝাঁ করবে, চোখ জ্বলে উঠবে উৎপলার তাকে থামতে বললে, গান থামাতে বললে। এমনিতেই বৌয়ের বিশেষ স্নেহশ্রদ্ধার মানুষ নিজেকে সে করে তুলতে পারে নি। মাল্যবানের স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন; সে নিজের মনে থাকা মানুষ; মানুষকে ক্ষমা করে যাওয়া অভ্যাস, অযথা হৈ রৈ হিংসার ছোব ভাল লাগে না তার। শান্তি ভালবাসে; নিজের সুখ-সুবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও। গানের সম্পর্কে সে স্ত্রীকে কোনোদিন কিছু বলে না বড়–একটা; বেশি ঝালাপালা বোধ করলে অবিশ্যি 'গান খুব ভাল করে শিখতে হয়,' 'অনেকে খুব মন খুলে গায়, ভাল লাগে; মন খুলেছে বলে ভাল লাগে–' এ-রকম এক-আধটা ইশারায় অনুযোগ জানায় মাল্যবান। এধরনের ইঙ্গিতের জন্যে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সত্যিই শাস্তি পায়; কাজেই পারতপক্ষে স্ত্রীকে কিছুই বড় একটা বলতে যায় না। নিজে মাল্যবান গানমুজরো না ভালবাসে তা নয়। যখন সে কলকাতার চাকরিতে বাঁধা পড়ে নি, পারাগাঁয়ে ছিল, সেই ছোটবেলা এক-এক দিন শীতের শেষ রাতে বাউলের গান শুনতে তার খুব ভাল লাগত; কোনো দূর হিজল বনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে সে–সুর ভেসে এসে তার কিশোর আঁতে ব্যথা দিয়ে যেত। কত দিন–যখন শেষ হয়–দান্ডাগুলি খেলে যখন সে কাঁচা-কাঁচা কালিজিরা ধানশালি রূপশালির খেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন; সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল-বোয়ালের মত দিঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির-ঝির ফটিক-ফটিক ঝিক-ঝিক ঝর-ঝর করে উঠত ওপরের জল; যে–জল গানের মত, যে–গান জলের মত চারদিককার খেজুরছড়ি, নারকোল ঝির ঝির ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে। বাপ–মাঝে ফাঁকি দিয়ে কত রাত সে যাত্রা শুনতে গেছে–তারপর সেই সব গানের সুর এমন পেয়ে বসেছে তাকে যে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ

করতে-করতে এক–একবার টেবিলের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ নিঝঝুম হয়ে পড়ে থাকত; কোথাও মেঘ নেই, বৈশাখ-আকাশের বিদ্যুৎ চমকানির মত ভরে যেত মন এ-কানা থেকে সে-কানায়; বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠবার পূর্বাভাসের মত; কিন্তু তার আগেই সে মাথা খাড়া করে অন্য পৃথিবীতে চলে যেতে চেষ্টা করত, ফোঁপাতে যেতন না। মণিভূপকণ্ঠ চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন–সত্যিই কি তাঁর নাম মণিভূপকণ্ঠ?–কী মানে এই নামের?–কিন্তু তবুও সকলেই তো তাঁকে এই নামে ডাকত; মণিভূপের গানের কথা মনে পড়ে; শমনহরা বোস–ঝুনু-ঝুনু বোস–চৌধুরাণী নামেই বেশি খ্যাত–তার গান; সে-সব দিন কোথায় গেছে যে আজ! পাড়ায়–পাড়ায় গানের বৈঠকের লোভে পড়াশুনা ফেলে যেমনি সে আসরের এক কিনারে গিয়ে বসেছে, অমনি কাকা তাকে কান টেনে–হিঁচড়ে বাসায় নিয়ে গেছেন; তবুও তার মায়ের সঙ্গে ষাট করে ফের আবার পালিয়ে যেতে ইতস্তত করে নি সে।

পলাকে এ সব কথা কোনোদিন বলে নি মাল্যবান।

ওপরের ঘরটায় পলা (উৎপলা) আর মনু শোয়। একতলার ঘরে মাল্যবানের বিছানা বৈঠক–সমস্ত। এখানেই সে থাকে, কথা বলে, কাজ বই পড়ে, লেখে, শোয়, ঘুমোয়। নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর কাছ থেকে এ–রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি সে। দোতালার ঐ একটা ঘরেই পলার ভাল করে কুলিয়ে ওঠে না তেমন, কাজেই সে স্বামীকে নীচের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছে। অথচ দোতলার ঘরটা একতলার ঘরের চেয়ে ঢের বড়–আলো–বাতাস, রৌদ্র, নীল আকাশের আনাচ-কানাচ-কিনারা, মূল আকাশেরও বড় নীলিমার বেশ মুখোমুখি প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে; একতলার পাশেই প্রকাণ্ড ছাদের একটা আশ্চর্য প্রসূতি রয়েছে, সিঁড়িটার দু ধাপ মাত্র গেলেই একতলার সমস্ত ছাদটা, আকাশ, রোদ কলকাতার শহরটাই তোমার; যদি ভেবে নিতে পারো, তা হলে পৃথিবীর নগরনাগরের ইতিহাস বারণাবত বেবিলনও তোমার চোখে ফুটে উঠেছে।

দুটি প্রাণী–ওপরে নীচে এই দুটি ঘরে আলাদা রয়েছে। মাল্যবানের বিয়ে হয়েছে প্রায় বার বছর হল। বিয়ের পর দু-তিন বছর পলা ঘুরোফিরে বাপের বাড়িতেই প্রায়ই থাকত; তার পর শ্বশুরবাড়িতে বছরখানেক থাকে, মনু হয়, মনুর ছমাস বয়েসের সময়েই বাপের বাড়ি চলে যায় আবার, সেখানে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বছর–দুই আরো কাটিয়ে এই বছর–সাতেক ধরে কলকাতায় স্বামীর কাছেই রয়েছে।

রাত একটা। ডান কাত ফিরে মাল্যবান একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল; নানা রকম কথা মনে হয়–ঘুম দূরে সরে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বাঁ কাত ফিরে মনে হল এইবারে ঘুম এলে বেশ ভাল লাগবে। কিন্তু ঘড়িতে দেড়টা বাজল, তারপরে দুটো, ঘুম এল না; এক-একটা রাত এ-রকম হয়।

কম্বলটা ঠোঁট অব্দি টেনে নিয়ে চোখ বুঝে আবার পাশ ফেরা গেল । কলকাতার রাস্তার নানা রকম শব্দ কানে আসে; রাত তো দুটো, শীতও খুব হজ্জুতে, কিন্তু কাদের ফিটন যেন রাস্তার ওপর দিয়ে খটখট করে চলেছে; গাড়ির ভেতর মেয়েদের হাসি, বুড়ো মানুষের মোটা গলা, ছোটদের চেঁচামেচি । মাল্যবান কম্বলের নীচে ফলি–কাত হয়ে থাকতে-থাকতে ভাবছিল; তাই তো কোথায় যাচ্ছ তোমরা মুনশিরা, ফিরছ কোত্থেকে? ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেক দূরে অব্দি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় এঞ্জিনের বিকট তড়পানিতে চারদিকের সমস্ত শব্দ গিলে খেল । এল, চলে গেল একটা লরি । মাল্যবানের মনে হল লরির এই লবেজান আওয়াজেরও একটা সার্থকতা আছে; যেমন বালির থেকে তেল বার করতে পারা যায়, সে–রকম; একে যদি চাকা–টায়ারের শব্দ না মনে করে বাদল রাতের ঝমঝম আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায় তবে বেশ লাগে লরির–খানিকটা চুনবালি খসে পড়ল চাতালের থেকে মাল্যবানের নাকে–মুখে; বাড়িটার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে, বাপ রে, একেবারে নিপ্পনের টাইডাল ওয়েভের মত ছুটে গেছে লরিটা; নাকমুখ থেকে চুনকাম ঝেড়ে ফেলতে–ফেলতে মাল্যবান ভাবছিল । রাস্তা দিয়ে কাহার–মাহাতেরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে । কার যেন প্রাইভেট মোটর মাল্যবানদের বাড়ির কাছেই এসে থামল–গাড়িটা–কী রকম বিগড়ে গেছে যেন; দু-চারজন মিস্ত্রি সেটা মেরামতের চেষ্টায় আছে; মবিল-অয়েলের গন্ধ মাল্যবানের নাকে ঢুকল, মন্দ লাগল না তার; একটা ষাঁড় ফুটপাথ দিয়ে যেতে-যেতে ঘঁগ-ঘড়ম করে উঠল এবার; সামনেই কাদের যেন দোতালার থেকে একটা বড় অস্পষ্ট কান্না ও ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাল্যবানের ঘরের পাশেই ড্রেনের কাছে একটা নেড়ি কুকুর ঘুর–ঘুর করে রাবিশের ভেতর থাবা নখ চালিয়ে বালি–ঘড়ির বাজনা চলেছে যেন অনেকক্ষণ থেকে; কী পাবে? খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতরমহলে–হয়ত কলতলায়, ভাঁড়ার ঘরে, গুদামে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নরও একটি মাদি নিশ্চয়ই; এই শীত রাতে এই আশ্চর্য শীতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনঋতুর, যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে–মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল, বেড়ালেরা লুটোপুটি ঝুটোপুটি কান্নাকাটি করে; বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো প্রফেসরকে ঠিক এই রকমই করতে দেখেছিল মাল্যবান প্রায় বছর–সাতেক আগে–সন্ধ্যারাতেই; গলাখাকারি না দিয়ে প্রফেসরমশাই-এর ঘরে রবারসোল জুতো–পায়ে ঢুকে পড়েছিল মাল্যবান; কিন্তু এ–রকম মইমারণ ব্যাপার যে হবে তা তো ধারণা করতে পারে নি সে; কিন্তু সেই থেকে উপলব্ধি করছে মাল্যবান যে সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে যে–মহৎ সংশ্লেষে উপস্থিত হওয়া যায় তারই আশ্চর্য সন্তাপ, উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতরতাকে ভাড়িয়ে চারিয়ে জ্বালিয়ে নাচিয়েই মানুষ তো

হয়েছে মানুষ। ভাবতে–ভাবতে অবসন্ন হয়ে মাল্যবান কাত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ঘড়িতে বাজল আড়াইটে, কিন্তু ঘুম তো এল না।

আজ ছিল তার জন্মদিনের তারিখ। বেয়াল্লিশ বছর আগে–এমনি অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে বাংলাদেশের একটা পাড়াগাঁয়ে সে জন্মেছিল। সেখানে খেজুরের জাঙ্গাল বেশি, তালের বন কম, সুপুরির গন্ধ হয়তো সবচেয়ে বেশি। এমনি শীতে খেজুরগাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে গলায় হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, সমস্ত শীতের রাতে ফোঁটা–ফোঁটা রস ঝরতে থাকে, মাছি–মৌমাছি ছোট ছোট রেতো প্রজাপতি, বড়গুলোও, সেই হাঁড়ির রসে সাঁতার কাটছে, পাখনা নাড়ছে, মরে আছে; কুয়াশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষ রাতে দেখা যায় এই সব। এমনি শীতের রাতে ধানের খেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে–হলদে নাড়ার গ্যাঁজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে, শীত পেয়ে দু–একটা বাঘ নেমে আসেঃ এমনি উদাস রাতে ফেউগুলো অন্তত খুব হাঁকড়ায়; শ্মশানে 'হরিবোল' যেন কোন দূর কুয়াশাপুরুষদের কলরোল বলে মনে হয়; লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশার সে কোন অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে–ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজি] সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কন শোনা যয় যেন। কোনোদিন কুয়াশা কম–শাদা মেঘ আছে–একফালি গড়ানে মেঘের পাশে–নিজের কেমন যেন একটা বৃহৎ আলোর শরীর নিয়ে থেমে আছে চাঁদ। পঁচিশ সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত পাড়াগাঁয় সে ফিরে ফিরে যেত, এই সব তার দেখবার শোনবার জিনিস ছিল, কিন্তু তারপর পনেরটা বছর কেটে গেল, এই শহরই হল তার আস্তানা, একটা কাঁচপোকা, মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে না তার, আকাশের নক্ষত্রগুঁড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না সে।

ভাবতে–ভাবতে আকাশের রূপালি সব্জালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা ভুলে গেল সে। পনের বছর চাকরির পর গত মাসে আড়াইশ টাকা মাইনে হয়েছে, এর আগে মাইনে ছিল একশ পঁচানব্বুই; প্রায় পাঁচ বছর ধরে একশ পঁচানব্বুই টাকাই মাইনে ছিল; তার আগে মাইনের ব্যাপারে বড় গরমিল ছিল। শাহেবদের অফিস বটে, কিন্তু এক সময় অফিসের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, যে–নামমাত্র মাইনেয় মাল্যবান ঢুকেছিল অনেক বছর পর্যন্ত তার দুর্ভোগ তাকে সত্য করতে হয়েছে। এই সময় কোনো–কোনো কেরানি অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মাল্যবান যায় নি; বরং যত্ন করে এই অফিসেই খেটেছে সে; আজ রাতে তার মনে হয় তার অনেক দিনের খিদমদগারির পুরস্কার সে পেয়েছে।

খিদমদগারি? কী আর বলবে সে। পূর্বপুরুষেরা তাকে যেমন শক্তি সুযোগ দিয়েছেন তাতে দেশের, মানুষের, আইনের, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্যে, এমন–কি পড়াশোনায়ও নিজেকে উৎসর্গ করবার কোনো পথ

তার নেই। সে–সব পথে যদি যেত কেউই তাকে মানত না; মানত কি?; লক্ষ্য উঁচু রাখলেও যে নীচে পড়ে ল্যাংচায় কে মানে তাকে? কাজেই এই পনেরটি বছর বসে ধীরে–ধীরে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের অফিসের জন্যে খেটেছে; কী করবে সে আর, কী করতে পারে?

বি–এ পাশ করে আইন পড়েছিল, কিন্তু তখনই এই অফিসের চাকরিটা পায়। চাকরিটা নিল সে।

মাঝে মাঝে মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে বটে; উকিল হলে মন্দ হত না, হয়ত বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, কারু তক্কাই রাখতে হত না, ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে মানুষের কাছ থেকে ঢের মর্যাদাও পাওয়া যেত। মনে হয় এক–এক সময়ে এই সব। কিন্তু মফস্বলের বার লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকিয়ে........কলকাতার বড়–বড় এম–এল, ডি–এল, কী করে টাকা রোজগারের ব্যাপারে জেলা শহরের কমিটিপাশ পি–এল এর কাছে হেরে যাচ্ছে কোথাও–দেখে–শুনে মনে–মনে মাঝে–মাঝে হাসে–অহঙ্কারে নয়, আত্মসৌকর্যে নয়, কিন্তু নিজের ক্ষমতার খর্বতা হাড়ে–হাড়ে অনুভব করে। মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে–কাজ সে করছে এর চেয়ে খুব বেশি ভাল কিছু কোনাদিনই সে করতে পারত না; হয়ত নিমকির দারোগা হত কিংবা সুপারিনটেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্টের চাকরির ছকে পড়ে গেলে একেবারে সবচেয়ে বড় কেরানিশাহেবও যে সে না হতে পারত তা নয়; টাকার দিক দিয়ে খানিকটা লাভ হত বটে; টাকা সে চায়ও, খুবই চায়, কিন্তু আরো অনেক জিনিস চেয়েছিল সে; বিদ্যা সবচেয়ে আগে। অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজের মনটা যে নেহাত কেরানির ডেস্কে–আটা নখেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা। নানা রকম ইচ্ছা–মনে অনেক রকম ভাল সুশৃঙ্খল কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে যে তার, মানুষকে সে তা জানাতে চায়; এক–এক সময় মনে হয় অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে–ধরো কোনো উত্তেজনাময় কর্মীসংঘের মধ্যে নিয়ে ফেলুক; জীবনটাকে এ রকম অফিসে চেপে সাপটে মেরে লাভ কী? টাকা–পারিবারিক সচ্ছলতা–এগুলোকে এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দুলের বিচি, রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয় এক–এক সময়। স্টিক হাতে নিয়ে গোলদিঘিতে ঘুরতে–ঘুরতে মনে হয়, একটা বড় বাজপেয়ে সভায় বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগের বিরাট অকূলপাথারে নিজেকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার; পলিটিকসে বাঙালিরা আজকাল গুজরাটি মারাঠি মাদ্রাজি ইউ–পিঅলাদের কাছে পদে–পদে ভুড্ডু খেয়ে ফিরছে–ভাবতে–ভাবতে রক্ত কেমন যেন হয়ে ওঠে তার, বাঙালির মান–সম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড় নয়াল আগুনের মত দাউ–দাউ করে উঠতে ইচ্ছা করে তার–বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে–ফ্রান্স, রুশ, স্পেন, চীন সমস্ত বিপ্লবেরর–ইয়ে–স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্যে। ভাবতে-ভাবতে বাঙালির কথা ভুলে যায় সে। অনেকক্ষণ পরে মাল্যবানের মাথা ঠাণ্ডা হয়;

গোলাদিঘির একটা বেঞ্চিতে ধীরে–ধীরে চুপ করে গিয়ে বসে সে তখন; একটা বিড়ি জ্বালায়। খিদে পেয়ে ওঠে, বাড়ির দিকে রওনা হয়।

একটা কথা ঠিক; মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মত (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়; এক জোড়া রেশমি স্টকিঙ, বার্নিশ করা নিউ কাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেট কেস ও ফুটবল গ্রাউন্ডের বেঞ্চি দিয়ে নিজেকে চোখ ঠার দিতে সে ভালবাসে না। এই সবের চেয়ে সে আলাদা।

খবরের কাগজ সে রোজই পড়ে; কিন্তু স্পোর্টস রেস রাহাজানির দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ে নয়; কোথাকার অন্তঃপুরে, আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল, বায়োস্কোপে কী থিয়েটারে কী আছে–এসব সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ বা আস্বাদ এ বেয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এখনও সে তৈরি করে নিতে পারেনি। খবরের কাগজে তবুও সে আশাতীত প্রয়োজনীয় নানা জিনিস খুঁজে পায়; অফিসের থেকে ফিরে চুরুট জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ সে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকে; এক–এক মনের ভেতর নানা রকম সাধ–সংকল্প খেলা করে যায়; ভেঙে চুরমার হয়। তারপর অবসন্ন হয়ে পেপারটা সে রেখে দেয়; মনে থাকে না বিশেষ কিছু; কোনো কিছু সত্যিই শিখেছে বলে উপলব্ধি করতে পারে না। বিছানায় শুয়ে–শুয়ে ভাবে নিজে সে অবিশ্যি পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না–কোনোদিনও না–কোনো প্রক্রিয়ায়ও না–কিন্তু পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন বাঙালির মধ্যে আজকালই যদি না জন্মায় তা হলে এ জাতের ভরসা খুব কম। উনিশশ উনত্রিশ সালের একটা রাত্তির; শুয়ে–শুয়ে এই সব কথা ভাবছিল যখন মাল্যবান; সেই জন্যেই সে এই রকম ভাবছিল।

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল; মাল্যবান দেখল বিছানায় চিত কাত হয়ে ভেবেই চলেছে ক্রমাগত; এত ভাবায় হৃদয় শুকিয়ে যায় শুধু, কোনো তীরতট পাওয়া যায় না, আসে না চোখে এক পলক ঘুম। আস্তে –আস্তে সে উঠে বসল; বিছানায় ছারপোকা আছে–কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ছারপোকার জন্যে নয়; এর চেয়ে ঢের বেশি আরশোলা, ইঁদুর, মশা, পিসুর ঘাঁটিতে লম্বা নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তার একটা গ্যাসল্যাম্পের আলো ঘরে ছিটকে পড়েছিল খানিকটা; স্লিপার খুঁজে নেওয়া গেল, পায়ে দিয়ে লাল–নীল–চেককাটা কম্বলে সমস্ত শরীরটা মুড়ে সে ধীরে–ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠল–নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল, নেটের মশারির ভেতর মনু ও পলা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে–কেমন শান্ত, প্রীত নিশ্বাস তাদের। একটা ভারী নিশ্বাস প্রাণের ভেতর প্রচুর চুম্বনে টেনে নিল সে, সমস্ত শরীরকে আস্বাদস্নিগ্ধ করে আস্তে–আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল সে; ভাল লাগল তার। ভালই লাগল তার ঘুমন্তদের দিকে তাকিয়ে; স্ত্রী সন্তানকে সচ্ছলতায় রাখা তাদের জীবনে খানিকটা সুখ–সুবিধে–শান্তির ব্যবস্থা করা–মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্যে এ শীত রাতে মাল্যবান সিদ্ধ দেখছে বলে। নিজের ঘুম হচ্ছিল

না তার-এরাই–বা এই শীতের মধ্যে কী করছে ঃ ঘুমিয়ে? জেগে? দেখবার জন্যেই সে ওপরে এসেছিল। দেখা হল। মাল্যবান সুস্বাদু পেল, কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হল তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এখন নীচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারির খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মত এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে–এদের জাগিয়ে?–বসে থাকতে চায়। কিংবা বসবেও না; মনুর কপালে আলতো হাত বুলিয়ে দেবে–কম্বলটা স্ত্রীর বুক থেকে সরে গেছে, তুলে গুছিয়ে দেবে আলতো। তারপর নিজের ঘরে চলে যাবে সে।

কিন্তু নেটের মশারি তুলতেই ব্যাপারটা অন্য রকম। উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে; তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে–মুহূর্তেই সে–ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা নদীর বালির চেয়েও বেশি বিরসতায় বললে, ‘তুমি!’

‘এসেছিলাম।’

‘এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে।’

‘দেখতে এলাম, তোমরা কী করছ।’

‘যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে যাও, কাল থেকে এ আমার সঙ্গে শোবে না। মেয়ের দাবনা ঘেঁষে, বাপ রে, একটা ডান যেন।’

‘কে, আমি?’ মাল্যবান দাঁড়িয়ে থেকে বললে। খাটে বসল না, একটা কৌচে বসে বললে, ‘না, মেয়েটিকে শুধু দেখতে আসিনি, আমি–’

‘আ, গেল যা! বসলে! রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ও মা। ও মা!–ও মা! বেরোও! বেরোও বলছি!’

‘তুমি ঘুমুচ্ছিলে–তোমার ঘুম ভাঙাতে আসিনি তো আমি–’

‘বলি, বলির কুমড়ো, দু–ফাঁক হবে না, না এখানে থাকবে?’

‘ঘুমুচ্ছিলে, ঘুমোও।’

‘ঘুমুচ্ছিলে ঘুমোও! আর, গোঁসাইয়ের কুমড়ো–’

‘কেন কুমড়ো–কুমড়ো করছ, উৎপলা–’

‘এখানে বসে থাকা চলবে না এখন।

‘আমি একটু বসে আছি, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। আমি এই কৌচে বসে আছি, মনু ঘুমুচ্ছে; ঘুমিয়ে পড়ো।’

উৎপলা গলাটা পরিষ্কার করে নিল, একটানা ছঘণ্টা ঘুমিয়ে বেশ সজীব সুস্বাদ হয়েছে শরীর, সরস কঠিন গলায় বললে, 'দরমুজ দিয়ে ইঁদুর মেরে ফেলেছি সব আমার ঘরের। তবুও যদি এক–আধটা থাকে জার্মান কল পেতে রেখেছি। ও–সব চালাকি চলবে না। ঘুম বড় বালাই আমার। চাও তো নীচে চলে যাও।'

মাল্যবান চুপ করে বসেছিল। সে চলে গেছে না কৌচে বসে আছে সে দিকে না তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু না বুঝতে পেরে উৎপলা বললে, 'ইশ, একেবারে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি মস্ত বড় একটা ড্যাকরা মিনসে কম্বল জড়িয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত বুকের রক্ত ঝিম–ঝিম ঝকর–ঝিম করে উঠল আমার।'

'কিন্তু দেখলে তো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এ রকম ভাবে ফের যদি আমাকে ভয় দেখাতে আস–'

'ভয় দেখাতে তো আমি আসি নি উৎ–'

'না, এসেছেন রূপ দেখাতে। ফের আমার ঘরের ভেতর ঢুকেছ কি রাত বিরেতে–' দাঁতের ওপর দাঁত চেপে কেমন একটা অদ্ভুত নিরেট নিগ্রহময়তায় বললে উৎপলা।

মাল্যবান শীতের রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা, যে–দীর্ঘতা নিঃশব্দতা যে–নিঃশব্দতা স্নিগ্ধতা। হতে পারত (কতবার পাড়াগাঁর রাতে হয়েছি) সে–সব সুর কেটে যাচ্ছে উপলব্ধি করে, উৎপলা যে–গুমোটের সৃষ্টি করেছে সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে সরু গোঁফে তা দিয়ে একটু হেসে বললে, 'রাত বিরেতে ওপরে চলে এলে উচ্চিংড়ের কাবাব বানিয়ে দেবে নাকি আমাকে, পলা!' বলে নিজেই হাসল মাল্যবান; হাসিটা এক–বগ্‌গা টের পেয়ে থেমে গেল; খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, 'আমি আজ এসেছিলাম–আমার আজ কেমন ঘুম চটে গেল–ঘুম চটে গেল–আমার আজ ঘুম হচ্ছিল না কিনা–'

'ঘুম হচ্ছিল না বলে পরের ঘুমের নিকুচি করতে হবে?'

'তা নয়।'

'তবে আবার কী।'

'আমি এসেছিলাম–' মাল্যবান মাথা হেঁট করে খতিয়ে, কী বলবে অনায়াসে সেটা স্থির করতে না পেরে কিছু বলতে গেল না আর।

উৎপলা বললে, 'এই যে আমার ঘুমটুকু নষ্ট করে গেলে এর ঝক্কি পোয়াতে আমি বেলা আটটা–নটার আগে উঠতে পারব না।'

'তা উঠো। যখন ঘুম পোষাবে তখন উঠবে, এর ঝক্কি পোয়াতে তখন উঠবে, এর আর কী কথা।'

'কাল সমস্তটা দিন মাথা ধরে থাকবে।'

'সকালে উঠে গরম–গরম চা খেয়ো ।'

'চা খেলেই মাথা ধরা সেরে যায়? এমন বেকুব!'

'তোমার তো স্মেলিং সল্ট আর মেনথল রয়েছে–'

'তাইতেই মাথা ধরা সারে! হু! ঘনিয়েছে ঘুরতে–ঘুরতে মুখ ফাঁক করে বলেছে বুঝি জয়নাথের বলদটা?'

উৎপলা গায়ের ঝালে মশারির ভেতরটা বেশ গম হয়ে আছে, খড়েরর উমের ভেতর যেন শুয়ে আছে মনু আর পলা; মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হত তা হলে কৌচে না বসে কোন যুগে ওদের ঐ নীড়ে জাপটে বসে থাকত সে; ভাবছিল মাল্যবান ।

'এক–আধটা অ্যাসপিরিন খেও' কিন্তু ওগুলো বিশেষ ভাল জিনিস নয়, না খেলেই ভাল ।'

'এই যে ঠাণ্ডা লাগল আমার তরাসে রাতে জেগে উঠে, কতকগুলো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছোট–ছোট সলতের মত পাকিয়ে নাকের ভেতর সেধিঁয়ে হাঁচতে হবে; কাল সমস্তটা দিন এই আমার কাজ; ভাবতে গেলেও মনটা খিঁচড়ে যায়; ছোঃ!'

মাল্যবান কৌচের থেকে উঠে এসে খাটের পাশে ভাঙা হাতলের হাল্কা চেয়ারটা টেনে চুপ করে বসল গিয়ে ।

'অ্যাসিপিরিনের শিশিটাও তো ফুরিয়ে গেছে, একটা পিলও যদি থাকে–'

'কাল এক ফাইল কিনে আনতে হবে ।'

'কাল সকালে চা আমাকে করে দিতে হবে ।'

'করে দেব ।'

'তিন-চার কাপ চা লাগবে আমার ।'

'গরম–গরম চা সর্দি–মাথাধরায় বেশ কাজ করে ।'

'হ্যাঁ, সর্দি জমেই তো এই মাথাধরা ।'

'এখনই ধরল?'

'না, তত ধরে নি; তবে ভোরের বেলা হবে, খোয়া–পাথরের ওপর হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন ঝগড়ুর বৌ–সেই কালো হয়ে লম্বা হয়ে সোমত্থ মাগিটা । বাবারে!' আড়মোড়া ভাঙতে–ভাঙতে আশ্চর্য আরাম বোধ করে আক্ষেপে চেঁচিয়ে–মেচিয়ে উঠে উৎপলা বললে, 'হাতুড়ি পেটাবে মাথার ভেতরে, এই হয়ে এল আর–কী । আমি বিছানা থেকে উঠতে পারব না । তুমি চা এনে আমার খাটের পাশে রেখে দিও তো বাপু ।'

'মনু কি ঘুমিয়ে আছে?'

‘ঘুমিয়ে আছে ওর ঠাকুরের থানে ।’

‘তার মানে?’

‘ঠাকুরের থানে দশায় পড়ে আছে ।’

‘জেগে আছে?’ মাল্যবান বললে, ‘ডাকব মনুকে?’ কিন্তু মনুকে ডেকে দেখবার কোনো চেষ্টা না করে মাল্যবান বললে, ‘আজ সারারাত ঘুমের টিপই এল না আমার চোখে, কেমন যেন হয়ে গেল; এক ফোঁটা ঘুম হল না ।

‘কাল তোমার কটার সময় অফিস?’

‘সাড়ে–দশটায় ।’

‘আমি তো উঠব খুব দেরি করে; হয়তো আটটা–নটা; তখন আমাকে চা করে দিতে পারবে?’

‘ঠাকুর দেবে । আমি দেব না–হয় ।’

উৎপলা সমস্ত শরীরে লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা পেতে বললে, ‘নাও, মশারিটা গুঁজে দাও তো মনুর পায়ের দিকে ।’

‘মশা তো নেই, মশারি টাঙাবার এক বাতিক তোমার ।’

‘মশা নেই, ইঁদুর আছে, মশারি না গুঁজলে পা কেটে খেয়ে যাবে ।’

‘মশারি ঠিক করে দিয়ে মাল্যবান চেয়ার থেকে উঠে দূরে একটা ময়লা তেলচিটে সোফায় গিয়ে বসল । উৎপলা বালিশে মাথা গুঁজে হাত–পা খিঁচিয়ে আলসেমি ঝেড়ে হাই তুলল, তুড়ি দিল, লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সর্বাঙ্গে । তারপর মাল্যবানের দিকে আন্দাজি নজরে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, ‘বসলে? বসলে যে বড়?’

‘কী করব?’

‘যাও নীচে যাও ।’

‘সেখানে গিয়ে কী হবে?’

‘এ রকম কতক্ষণ বসে থাকবে শুনি,–’

‘তোমার সাথে কথাবার্তা বলব–’

‘দাঁতে ঠেকে যাবে জিভ, বেশি কথা বলতে গেলে । দাঁতকপাটি হয়ে যাবে । দাঁতে চামচে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে–ঢেঁকির পাড় দিয়েও খুলতে পারা যাবে না আর–নাও, সুড়–সুড় করে সরে পড় দিকিন–’ উৎপলা পাশ ফিরে শুল ।

মাল্যবান বসে রইল কনকনে ভিজে শীতে কেমন ন্যাতাজোবরার মত। কাজ নেই, কথা নেই, চোখ বোজা নেই, নড়াচড়া নেই, কোনো কথা সে ভাবছিল বলেও মনে হচ্ছিল না।

'কী রকম মানুষ তুমি।'

'বসে তো রয়েছি শুধু।'

'এতে আমার ঢের অস্বস্তি।'

'কী করতে হবে তা হলে?'

'চলে যাও।'

'ঘুমাবে এখন?'

'মুখে নুড়ো ঢেলে দেব আমি বেহায়া মড়াদের! ঘুমোবে? ঘুমোবে! রাত তিনটের সময়–' কেঁদে ফেলল হয়তো উৎপলা। কিন্তু তবুও সে তো বালিকা বধূ নয়–প্রায় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। মাল্যবান একটা দমে যাওয়া নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যা–ই।'

একটু পরে ফিরে তাকিয়ে চড় খেয়ে সেঁটে চড়িয়ে দেবার মত গলায় উৎপলা বললে, 'তবুও বসে রইলে!'

'কই, তোমার চোখেও তো ঘুম নেই আর।'

'তোমার জিভে আছে; নীচে নেমে যাও শিগগির; যাও–নামো–'

'যাচ্ছি, কিন্তু রাত তো ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়।'

উৎপলা বিছানার ওপর উঠে বসল। এবার সে কথা বলবে না আর, একটা বিষম কিছু করে বসবে মনে হল। কিন্তু মাল্যবান নিজের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল; উত্তরপক্ষ কী করছে, না–করছে দেখল না সে, চোখেই পড়ল না তার কিছু। বললে মাল্যবান, 'কাল তো বিশে অঘ্রাণ মাসের বিশ তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল। তোমাকে হয়ত এক আধবার বলেছি–মনে আছে তোমার? নিজেরই বলে কিছু মনে থাকে না। এই দিনটায় ঢের ভাববার কথা ছিল; বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেল জীবনে। সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনও চলছে–চলবে যে–পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি। কিন্তু লালকমল নীলকমল কালোবাতাস শাদাবাতাস মনপবন আর চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন অপার্থিব করে তুলেছে জীবনটাকে। আমি মাটির মানুষ তো–মাটির ছাড়া টাল সামলাতে পারব না–হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভাল, তার চেয়ে মাটি শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কপ্পুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেব না?

একেবারেই দিতে যে না পারে উৎপলা তাও নয়, দিয়েছে মাঝে–মাঝে, গোড়ার দিকে খুব মন মজিয়েও দিয়েছে বটে, কিন্তু তারপরে টান কমে গেছে, খুব বেশি কমে গেছে–দুদিক থেকে সমান অনুপাতে যদিও নয়; উৎপলা জানে সব; মাল্যবানও জানে দাম্পত্যজীবনের অনেকগুলো দিক না হলেও চলে আজ উৎপলার, শাড়ি–গয়না–খাওয়া–দাওয়া আরামবিরাম ফলা–ছেড়া বিলাস–স্বাধীনতা হলেই হল তার, মাল্যবানের কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ দিক এখনও চাই–ই যেন, অনেক দিনের ভেতরে এক–আধ দিন অন্তত চাই, মাটির দিকটাই চাই, সোনার দিকটাও নয়, কিন্তু নিজের সোনার ঝিলিক মাঝে–মাঝে মাল্যবানকে দেখালেও গত পাঁচ–ছয় বছর ধরে মাটির সঙ্গে কোনো যোগ নেই উৎপলার–সে তো আকাশের মেঘ, জলভারানত নীল মেঘ নয়–শাদা কড়কড়ে, মেঘ–দূরতম আকাশের।

উৎপলা চুলের সিঁথি অব্দি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। মাথায় রক্ত উঠেছিল তার, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে–ঘুমোতে হবে; নায়েব, গোমস্তা, চাকর–বাকর রাক্ষস–খোক্ষস লালকোমল–নীলকমল ভ্যাক–ভ্যাক করেছে–তার ভেতর সে ঘুমিয়ে পড়েছে–এ রকম ব্যাপার কতবার তো ঘটেছে তার জীবনে, আজ ঘুমোতে হবে।

‘আজ বিশে অঘ্রাণ’, মাল্যবান বললে, ‘পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভাল ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে; হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে–মাঝে তুচ্ছ বেনে–বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব, খাচ্ছি–দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি। আছে অনেক ফাঁক, আলো, নানা রকম বড় আকাশ ঘাস ও–সব পাখিদেরও; কিন্তু সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু কি আছে মানুষের? ... এই সব, আরো অনেক সব বলতে চাইল মাল্যবান; কিন্তু বলাটা তার না হল সাহিত্যের ভাষা, না হল নিজেদের মুখের ভাষা; মানুষের জল রক্তঅশ্রু ঘামের মধুসুধার ভাষা তো এ–রকম নয়। মাল্যবান টের পেল। এবারে সে না সাজিয়ে–গুছিয়ে একেবারে রক্ত ঘাম সুধা স্বাভাবিক প্রাণের ভাষায় কথা বলবে। কিছুক্ষণ দেঁতো কথা ছেঁদো কথার পর সত্যিই যখন বারোয়ারি বাজারের বাসরঘরের কথা মুখে এল তার, নাক ডাকার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবুও চালাতে হবে মৃত্যু পর্যন্তই। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন স্বামী–স্ত্রীর জীবনেই এই নিস্ফলতা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী–স্ত্রীরাই সেটা ঠিক মাল্যবানের মত উপলব্ধি করতে পারে না; যে–সব স্ত্রী–স্বামীরা সেটা করে, একটা ভাঙা গেলাশের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের; নারী–পুরুষের সম্বন্ধ, স্বামী–স্ত্রীর ব্যাপার, বিয়ে জিনিসটা, শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাচের গেলাশের মতই সহজ ও কঠিন, ভাঙবেই; জল খেতে হবেই; একটার বেশি গেলাশ কাউকে দেওয়া হবে না; সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয় সেটা অসামাজিকতা হল। দর্শনী বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে

বিয়ে রদ, বিয়ে খণ্ডন করে আবার বিয়ে, যদৃচ্ছা বিয়ে করবার কথা পেড়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু টাকাওয়ালা জাতিগুলো টাকাওয়ালা মানুষদের সম্পর্কে এ–সব সমাধানের কিছু–কিছু মানে থাকলেও বেশি কোনো মানে নেই, মাল্যবানদের মত গরিব জাতির গরিবদের পক্ষে কোনো মানেই নেই কেবলই বিয়ে–খণ্ডন ও যদৃচ্ছা বিয়ের। গরিব জাতিদের সমাজগুলো মজন্তালি সরকারের মত হেসে পেট ফাটিয়েই মরে যাবে কেবলি বিয়ে খসিয়ে নতুন বিয়ে সম্পর্কের ভেতর মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখলে, কিংবা বিবাহসম্পর্ক তুলে দিয়ে মেয়ে–পুরুষের স্বাধীন সেয়ানা মেলামেশায় রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার অন্ত খুঁজে পাবে কি বিজ্ঞান–আকাশের তারা, পাতলের বালি যদিও গুণে ঠিক করেছে বিজ্ঞান। সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার কল্যাণের অন্ত খুঁজে পাবে হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্র? কোনোদিনও না। কিন্তু সে–রকম হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্রই–বা আসছে কোথায়? কোনোদিকেই না। খুব একটা গরিব জাতির মানুষ মাল্যবান। তার চেয়ে ঢের দুঃস্থ নিষ্পেষিত মানুষ আছে; তাদের অবস্থা আরো ঢের খারাপ–কিন্তু তাদের পেটের সমস্যা এ–সব সমস্যাকে অনেকটা চেপে রেখেছে; এ–সব সমস্যা সমাধানেও তাদের বেশি বেপরোয়া বা মরিয়া বা সাহসিকতা সচ্ছলতা আছে–যেমন অন্য এক হিসেবে উঁচু শ্রেণীর ভেতরে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাল্যবানের মত মধ্যশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর–না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্নমধ্য বিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্য শ্রেণীতেই কেমন দুর্বিষহভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, অথচ বাঙালি মধ্যশ্রেণীরা অন্তত ভাতকাপড় পেলে কেমন সুখে–শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারে দেখবার জিনিস। স্বামী–স্ত্রীর সম্বন্ধ তো দূরের কথা-স্ত্রী–পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সৃষ্টির কারণকরণশালিকার ভেতর কোনো সুখশান্তির নির্দেশ নেই তো। কিন্তু বাঙালি স্বামী–স্ত্রীদের প্রেম ও যৌন জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে, শতকরা একশ জনেরই তো; ভাবছিল মাল্যবান একটু বিষণ্ন শ্লেষে হেসে উঠে। উৎপলা শীত রাতের কী এক পরমত্বের ভেতর ডুবে গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে–মাল্যবানকে কেমন সহজ দিব্যতায় বিদায় দিয়ে, অথচ মাল্যবানকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, অপ্রেমে, কামনার টানে, বেশি লালসায় রিরংসায় উৎপলার মতন একজন ভাল বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে–ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণ ভাবে, কেমন অধমের মত, কেমন হাতে–পায়ে ধরে মেয়েটির কখনো–বা ঘরের শান্তি কখনো বা বাইরের সুনাম রক্ষা করবার জন্যে, কখনো–বা লালসা, অতিক্কচিৎ প্রণয় এসে উৎপলার দিকে মাল্যবানকে হিঁচড়ে টানছে বলে।

আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানির গন্ধের মত অন্ধকার; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই

বালুঘড়ির ঝির–ঝির শির–শির ঝির–ঝির শব্দ; উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে–মাল্যবানের অন্তরাত্মায় ।

দোতলার ঘরটার লাগাও বাথরুম ছিল । বাথরুমটা থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা ছাদ পাওয়া যায় । সমস্ত ছাদটা বড় মন্দ নয় । কিন্তু অন্য ভাড়াটে পরিবারটি ছাদের বেশির ভাগটাই প্রায় নিজেদের জন্যে আলাদা করে রেখে দেওয়া দরকার মনে করেছে । কয়েকটা বেশ সুন্দর সবুজ তার্পলিন টাঙিয়ে ভারি চমৎকার একটা পার্টিশন করা হয়েছে । পার্টিশনের ও–দিকে একটা ডেকচেয়ার, গোটা–দুই বেতের চেয়ার, তেপয়, জলচৌকি, সেলাইয়ের কল, মনুর পড়াশুনার বই । কোনোদিন–বা একটা হারমোনিয়ম বা সেতার নিয়ে সমস্ত সকালবেলাটা গড়িমসি করে কাটিয়ে দেয় উৎপলা ।

এ–জায়গাটা তার খুব ভাল লাগে ।

দুপুরবেলা রোদ খুব চড়চড় করে ওঠে বলে খানিকটা সময় বাধ্য হয়ে তাকে ঘরের ভেতর থাকতে হয় । কিন্তু সূর্যটা যেই একটু হেলে পড়তে থাকে, তার্পুনিলের ছায়ায় ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে গিয়ে উৎপলা; গুন গুন করে, অথবা সেলাই; পড়ে নভেল, মনুকে পড়ায়, এস্রাজ বাজায় ।

মাল্যবান সন্ধ্যের সময় মাঝে–মাঝে ছাদে আসে; একটা চেয়ারে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে । মাঝে–মাঝে মনুকে ডেকে ইতিহাস–ভূগোল–পৃথিবীর কথা, ধর্মের কথা, মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবনের মানে–প্রথম মানে–মাঝারি মানে–বিশেষ করে অন্তিম অর্থ সম্পর্কে অনেক জিনিস একে-একে শেখাতে যায় সে । মেয়েটির সব সময়ই সে–সব খুব ভাল লাগে না–মেয়েটিকেও ভাল লাগে না মাল্যবানের; কিন্তু অনেক সময় মেয়েটি খুব নিরিবিলি শোনে; ভাসা ভরা চোখ তুলে কী ভাবে কেউ কি তা বলতে পারে । উৎপলা বলে ঃ মেয়েটা একেবারে বাপের গোঁ পেয়েছে । শুনে ভাল লাগে মনুর । কিন্তু নিজে মাল্যবান মেয়েকে যে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসে তা নয়; স্ত্রীর জন্যেও প্রমাণ শ্রদ্ধা ভালবাসা রয়েছে তার । কিন্তু এদের জন্যেই সে প্রাণে বেঁচে ফিট সার্থক হয়ে রয়েছে, সে কথা ভাবা হয় তো ভুল । মনটা তার অনেক সময়ই একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মত আকাশে–আকাশে ফসলে–ফসলে ভেসে যেতে চায় । বেশিক্ষণ এ–ছাদে বসে না সে; ধুতি–চাদর পরে বেরিয়ে যায়–ময়দানে গেলেই ভাল হত; কিন্তু গোলদিঘিতেই যায়; ছড়ি হাতে করে অনেক রাত অব্দি পাক খায় সে–অনেক কথা ভাবে–কেরানির ডেস্ক ও উৎপলার স্বামিত্ব থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে–(কিন্তু কোনোটাই খুব নির্বিশেষে দানা বাঁধা নয়)–সে অনেক রকম আলতো জীবন যাপন করে । তারপর অবসন্ন হয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, একটা চুরুট জ্বালায়; খিদে পায়; বাড়িতে ফিরে আসে ।

দোতলার বাথরুমে মাল্যবানকে চান করতে দেয় না উৎপলা ।

‘অফিসে যাবার সময় সাত–তাড়াতাড়ি চান করে তুমি জল ময়লা করে ফেল–তুমি বাবু নীচের চৌবাচ্চায়ই নাইবে–’

‘কিন্তু যে–দিন অফিস নেই?’

‘হ্যাঁ, সে–দিনও।’

অতএব নীচেই চান করে মাল্যবান; এক–এক দিন তবু গামছা–কাপড় নিয়ে দোতালার স্নানের ঘরের দিকে যায়।

‘এক টব আন্দাজ জল ধরে রেখেছি–ওসব ফুরিয়ে যাবে–’

‘এখনও তো কলে জল আছে,’ বলে মাল্যবান।

‘এই তো এখুনি মনু চান করতে যাবে।’

‘আচ্ছা, বেশ, সে তৈরি হয়ে নিক, ওর মধ্যেই আমার হয়ে যাবে।’

‘নীচের চৌবাচ্চার কী হল?’

‘কেন, পাশের ভাড়াটেরাও তো সেখানে চান করে না, দোতলায় তাদের একটা বাথরুম আছে, সেখানেই তো তাদের সকলের কুলিয়ে যায়।’

‘আরে বাবা, ঢেঁকির সঙ্গে তর্ক। তাদের তো পুকুরের মত বাথরুম। তাদের আর আমাদের–’

‘লোকও তো তাদের অনেক; কিন্তু নীচের চৌবাচ্চায় তবুও তো কেউ চান করতে যান না।’

‘ওদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ আছে যে যাবে? যে–কটি আছে, তাও তো মেয়েদের পাশে–পাশে ফেরে। না হলে মেয়েমানুষের গোসলখানায় কখনো মিনসেরা ঢোকে?’

মাল্যবান একটু উইঢুকু করে নীচের চৌবাচ্চায় চলে গেল।

একদিন আবার স্নানের সময় উৎপলাকে বললে, ‘দেখ, নীচের জল বড় ঠাণ্ডা।’

‘এত শীতে জল গরম পবে কোথায় তুমি,’ বললে উৎপলা, ‘ঠাকুরই তো রয়েছে, তাকে দিয়ে এক কেটলি জল গরম করিয়ে নিতে পার না?’

‘তা পারি বটে,’ মাল্যবান অবসর মত একটু ভেবে নিয়ে বললে, ‘কিন্তু ও–রকম ভাবে গরম জলে চান করলে বড্ড বদ–অভ্যেস হয়ে যায়। শরীরও খারাপ হয়ে যায়।’

‘কী চাও তা হলে।’

‘তোমাদের টবের জল একটুও ছোঁব না, ট্যাপের নীচে একটু বসব।’

‘দিক করো না বাপু, মনু এই চানে যাচ্ছে–’

‘তা আসুক–না, আমার সঙ্গেই আসুক।’

'তোমার সঙ্গে আসবে!' উৎপলার চোখদুটো পাক খেয়ে ঠিকরে উঠল, 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা দেখ। না, না, ও–সব হবে না। নীচে যাও–নীচে যাও তুমি?

'এই কথা বলো তুমি?'

মাল্যবান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে নীচে চলে গেল। অফিস যাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা বলতে গেল না–অফিস থেকে ফিরে এসেও না। কিন্তু দেখা গেল তাতে কারুরই কিছু এসে যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে আড়ি ভাঙতে হল। আড়ি ভাঙতে গিয়েও দেখে স্ত্রীর মানই বেশি। কাজেই আড় ভাঙবারও প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

মাল্যবানের তবুও পথ কাটা হয় না।

ছুটির দিন একদিন বললে, 'নাঃ, নীচে আমি আর চান করতে পারব না।'

উৎপলা সে–কথায় কানও দিতে গেল ন।

'পঁচিশ দিনের মধ্যে একটিদিনও যদি জল বদলানো হয় নীচের চৌবাচ্চার? পচা জলে চান করে অসুখ করবে আমার!'

'শালগ্রামের কথা শোন', উৎপলা বললে, 'কানে ধরে কাজ করিয়ে না নিলে পচা জল বেনো জল, সাতঘাটের জল এসে খায় মানুষকে। চোখ–কান বুজে ঠাকুর–চাকরদের ঘাড়ে চান করা চলে কি? ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস তো ওদের আঁতুড়ের থেকে। জল কেন বদলাবে, কী দায় ওদের!'

'আমি নিজে তবে বাসি জল খালাস করে চৌবাচ্চায় ঝাড়ু লাগাব রোজ? নতুন জল রাখব?'

'চাকরকে নাই দিলে তাই করতে হয়। এটা তো কোনো অপমানের কাজ নয়–' উৎপলা সেলাই করতে–করতে বললে, 'তোমার নিজেরই তো সুবিধে।'

'কিন্তু এ দু–বাড়ির এত চাকর–ঝির সামনে চৌবাচ্চার বাসি জল নিকেশ করব আমি চৌবাচ্চার ছ্যাঁদার ন্যাতা খসিয়ে?' মাল্যবান পায়চারি করতে–করতে থেমে দাঁড়িয়ে একটু বিলোড়িত হয়ে উঠে বললে।

'খসাবে তো।'

'ঝিগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসবে?'

'কেন, বল তো? এ–রকম হ্যাংলা ঝি কোথায় দেখলে তুমি?'

'আমি দেখেছি। তুমি দেখবে কী করে। সংসারের তুমি বড় জান কি না। কত রকম জীবন আছে! কী দেখেছ তুমি!'

'থাক, ও–সব জেনে আমার কী দরকার!'

মাল্যবান বললে, 'তাই বুঝি সংসারের বার তুমি?'

উৎপলা শেমিজ ঢাকতে–ঢাকতে কোনো উত্তর দিল না।

‘এই যে আমি চান করি’, মাল্যবান আবার পায়চারি করতে–করতে বললে, ‘তুমি মনে কর এতে তোমার খুব নামডাক?’

উৎপলা ঠোঁটের ভেতর সুচ গুঁজে শেমিজটা নেড়ে–চেড়ে দেখছিল; বললে, ‘বড্ড ছিঁচকে তুমি।’

‘আমি?’

‘একটা কথা নিয়ে এত বাড়াতে পার–’

‘ওপরে কল রয়েছে, বাথরুম রয়েছে, অথচ আমি চৌবাচ্চায় চাকর–বাকরদের মত দিনের পর দিন চান করি–ওদিকের ভাড়াটেরাই–বা কি মনে করে।’

উৎপলা ঠোঁটের থেকে সুচ নামিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, ‘এ সব ন্যাকড়া তারা দেখতেও যায় না। বড় মন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। একটা ঢ্যাঙা মিনসেকে চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়াতে দেখলেই তারা হেসে শুয়ে পড়বে? নিজের বাপকে দেখে চোখ ওল্টাবে?’

মাল্যবান পায়চারি করতে–করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে বললে, ‘সে–দিন শুনলাম মেজগিন্নি বলছেন, ‘চাকরবাকরদের চৌবাচ্চায় কেরানিবাবুটি চান করেন, জল কি কলকাতায় সোনার দরে বিকোয় না কি মেজদি–এই সব, এইসব, ছ্যাঃ, শুনে চন করে উঠে মাথার লোম খাড়া হয়ে পড়ে–’

‘কে বলছিল এই কথা?

‘মেজঠাকরুন।’

‘তা সৎগুষ্টির মেয়ে তো এই রকমই বলবে।’

‘ঠিকই তো বলেছিল।’

‘ঠিকই যদি বলেছিল, তুমি মুখে কোঁচা গুঁজে চোরের মতন এলে যে?’

‘আমি কী করতে পারি। পরের বাড়ির ঝি–বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব? কী বল তুমি উৎপলা?’

উৎপলা সেলাই করে চলেছিল, সুচটা আবার ঠোঁটে–দাঁতে আটকে নিয়েছে, বললে, ‘পরের বাড়ির বৌ তো বললে, কিন্তু বাড়ির ভাতার–ভাসুরদের শুনিয়ে–শুনিয়ে যারা এই রকম কথা বলে–’

মুখের কথা না শেষ করে থেমে গেল উৎপলা।

মাল্যবান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একটা ছেঁড়া তেলেময়লায় ঘামানো–চেমানো কৌচে বসল সে, আস্তে–আস্তে বললে, ‘যাক। আসল কথা হচ্ছে এক গা লোক নিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বৌ–ঝিদের আনাগোনা চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে জুত লাগছে না আমার। এক–একটা বৌ

ওপরের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার চান দেখে–যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে–সমুদ্রস্নান হচ্ছে।'

উৎপলা কল চলাতে–চালাতে বললে, 'তা হলে তুমি কি বলতে চাও, দরজা–জানালা বন্ধ করে এক হাত ঘোমটা টেনে তুমি ওপরের বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি নীচের চৌবাচ্চায় যাব–ওপরের বারন্দায় ভিড় জমিয়ে দিয়ে ওদের মিনসেগুলোকে কামিখ্যে দেখিয়ে দিতে?'

'না, তা কেন?' ছেঁড়া কৌচের ছারপোকার কামড় খেতে–খেতে একটা বেশি কামড়ে যেন অস্বস্তি বোধ করে মাল্যবান বললে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রকম হলেই তো ভাল হত।'

'আমার কথাটা তুমি বুঝলে না।'

'আরে বাবা, সব বুঝি আমি। দেখেছি অনেক জমিদারের ছেলেদের আমি, আঘন–পোষের শীতে একটা পুকুর–ডোবা পেলেই ঝাঁপিয়ে জাপটে চান করছে। চোখ জুড়িয়ে গেছে দেখে। এক ফোঁটা জলের জন্যে মেয়েমানুষের কাছে এসে হামলা!'

মাল্যবান উসখুস করে উঠে গেল।

ছুটির দিন ছিল; চৌবাচ্চা ছাড়া আরো অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু বলবে কাকে? শোনবার লোক কই? অনুভূতির সমতা নেই, সরসতা নেই; ছাদে খানিকক্ষণ টুইমুই–টুইমুই করে হেঁটে, থেমে, বসে থেকে মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকল; একটা চেয়ারে বসে বললে, 'জীবনের সাতাশ–আটাশ বছর আমিও তো পুকুরে চান করেছি।

'বেশ করেছ।'

'জমিদারের ছেলেদের কথা বললে কিনা। কিন্তু কলকাতায় পুকুর পাব কোথায় বল তো দেখি।'

'চৌবাচ্চাই কলকাতার পুকুর।'

'বলেছে। কিন্তু গামছা পরে চান করতে হয়–চারদিকে মেয়েরা থাকে–'

'হাঁচতে–কাশতে রূপও বেরিয়ে পড়ে রূপলালবাবুর। মেয়েরা হেঁসেলের ছ্যাঁচড়া পুড়িয়ে আড়ি পেতে থাকে রূপলালবাবুকে দেখবার জন্যে। হেঁচেলে দুধ ধরে যায়–গায়ে–গায়ে ঠাসাঠাসি মাছপাতরি হয়ে রূপই দেখে মেয়েরা রূপসাগরের–'

মাল্যবান আস্তে–আস্তে নীচে নেমে গেল। বিছানায় শুয়ে–শুয়ে ভাবল; আজ অফিস ছুটি ছিল, কথা বলবার ছিল ঢের, কিন্তু উৎপলা মনে করবে, ঝুড়ি খুলে বসেছি–পুরুষমানুষ হয়ে।

মেয়েমানুষ–পুরুষমানুষের অন্তঃসার ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও বটে এই মেয়েটির! কোথায় পেল সে এ–ধারণা? কে শিক্ষা দিয়েছে তাকে? অপ্রেম–হয়তো অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে ।

একটা চুরুট জ্বালিয়ে মাল্যবান ভাবল, 'পুরুষমানুষ' হয়ে এ–সব মেয়েদের কাছে জীবনের বড়–সড় হাড়ামদড়াম কথা ছাড়া কোনো মিহি কথা বলতে যাওয়া ভুল; কোনোদিন যদি তারা সেধে শুনতে আসে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয় । সেটা সুফলা জিনিস হয়? চুরুটে কয়েকবার টান দিয়েই মাল্যবান ভাবল–কিন্তু সে রকম ভাবে উৎপলা আসবে না কোনোদিন । বারটা বছর তো দেখা গেল । এই স্ত্রীলোকটি মিষ্টি হোক, বিষ হোক, আমার জীবনের রাখা–ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরের মত কথাগুলো শুনতে আসবে, সে পাখি ও নয় । ওর চেহারা যদি কালো, খারাপ হত, তা হলে তো চামারের মেয়েরও অযোগ্য হত । একটা মোদ্দাফরাসকে নিয়ে ঘর করছি আতাবনের পাখির মত–নেই–সেই পাখিনীকে চেয়ে আমি–

কিন্তু নিজের চিন্তাধারণা ও উপমার কেমন একটা আলঙ্কারিক অসহজতায়-অস্বাভাবিকতায়ও বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল মাল্যবানের মন । জিনিসটা ঠিক এই রকম নয়, অন্য রকম । কিন্তু কী রকম? যে–রকমই হোক, কোনো সহজ স্বাদ নেই জীবনে–খাওয়া–দাওয়া শোওয়া ঘুমানোর স্থূল স্বাদগুলোও সূক্ষ্ম হতে চেয়ে গোলমাল করে ফেলল ।

'তোমার মাইনে তো আড়াইশ টাকা হল–এমন একটা কেলেঙ্কারি ঘোচাও তো ।'

'কী করতে হবে?'

'ছাদে পাতপিঁড়ি পেতে খাওয়ার পক্ষপাতী আমি নই;' উৎপলা বললে ।

'দিব্যি তো গায়ে বাতাস লাগিয়ে আলোয়–আলোয় মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া হয়', মাল্যবান যেন নাকের আগায় চশমা ঝুলছে তার, এমনিভাবে একদৃষ্টে, সনির্বন্ধতায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আন্ধি ঘুপসির থেকে বাঁচোয়া না? ছাদের আলোয়? ছাদে খাওয়াটা তো বেশ । আমার তো বেশ ভাল লাগে ।'

'ছাদটা একটা আঁস্তাকুড় হয়ে থাকে ।'

'সে আর কতক্ষণ?'

'নিজে তো অফিসের মুখে দিব্যি চাকলা গিলে হুট করে গাছের মাথায় চড় গিয়ে কি না–কী দিয়ে কী হয়–ঝামেলা হামলা আমি একা বসে পোয়াই আর কী ।'

'এঁটো গড়াতে থাকে অনেকক্ষণ?'

'ঠাকুরের সঙ্গে ঝি পিরিত করবে, ঝির হাতে ঠাকুর খইনি টিপবে–তারপরে তো এঁটোর কথা মনে পড়ে–'

'এই রকম?' মাল্যবান মুখে দু–একটা কালমেঘ ঘনিয়ে এনে বললে, 'কতক্ষণ ফেলে রাখে? দু–তিন ঘণ্টা?' একটু চুপ থেকে মাল্যবান বললে 'বড় বেয়াদব তো তা হলে–' আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কথা ভেবে ঠিক করে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'এ–ঝিটাকে উঠিয়ে দিতে হয় ।'

'না, সে–সবের কোনো দরকার নেই ।'

'এই না বললে ঠাকুরের সাথে পিরিত করে?'

'তা করুক, আমাদের তাতে ক্ষতি কী?'

'কিন্তু সে সব ভাল নয় তো ।'

'আমাদের কাজ নিয়ে কথা; ওদের অন্তর্জলীর ভেতর নাক ঢোকাতে যাব কেন?'

'কিন্তু ভাদুরানীর স্বামী রয়েছে–তবুও ঠাকুরের সঙ্গে এই রকম ।'

'তুমি তো আচ্ছা বেকুব দেখছি!'

'কেন?'

'ছোট জাতের ভেতর কত রকম কাণ্ড হয়!'

'ছোটজাত? ভাদুরানী তো বামুনের মেয়ে ।'

'তা হবে । বেশ তো–ঠাকুরও তো বামুন–'

ঠাকুরও বামুন ; মাল্যবানের কাছে ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্যে চীনে প্রবাহের মত সরল অথচ কঠিন, কঠিন অথচ সরল বল মনে হল; কী যে এই সহজ ব্যাপারটা–কী এরমানে কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারল না । তামাকের ধোঁয়ায় নোংরা দাঁতগুলো বের করে–সেই দাঁতগুলোর মত আকাট অবর্ণনীয়তায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে রইল সে ।

ছাঁদে না খেয়ে এখন থেকে ছাদের উত্তরদিকের ঘরটায় খেলে হয়–বেশ ফটফটে ঝরঝরে ঘরটা–'

'কিন্তু ওটা তো ও–ভাড়াটেদের–'

'না গো, ওরা ও–ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে ।'

'কবে ছেড়ে দিল?'

'কাল ।'

মাল্যবান একটু ভেবে বললে, 'ওটার ভাড়া তো কম হবে না'–

'পঁচিশ টাকা চায়–আমি বলে কয়ে কুড়ি টাকা করতে পারব,' বলে একটু ঝিকমিক করে হেসে মাল্যবানের দিকে তাকাল ।

মাল্যবান ভুরু উঁচকে বললে, 'কুড়ি টাকা অতিরিক্ত খরচ আবার?'

‘কিন্তু তোমার মাইনেও তো বেড়েছে ।’

‘কিন্তু দশ রকম খরচও তো বেড়েছে । এটা আবার কেন?’

‘কিন্তু ছাদে খাওয়া অসম্ভব–’

মাল্যবান ভাবছিল : নাকের আগায় যেন তার চশমা ঝুলে পড়েছে, এ–রকম কেমন এক অথৈ শূন্যতার ভেতর থেকে নিশ্চুপ একনিষ্ঠতায় ও সনির্বন্ধতায় উৎপলার দিকে তাকিয়ে ।

‘খেয়ে উঠতে–না–উঠতেই কাক চড়াই এসে সমস্ত এঁটো চারদিকে ছড়াবে, ছাদে যে–কাপড়গুলো শুকোতে দিই তার ওপর মাছের কাঁটা, আলু–মশলার হলুদের ছোপ, পাখির বিষ্ঠা; রাধার কলঙ্কের চেয়ে কেষ্টোর কলঙ্ক বেশি : ক্যাঁকড়ার গাঁধি, চিংড়ির দাঁড়া, ছিবড়ে পিঁপড়ে, মাছি সমস্ত ছাদে মই–মই করছে রে বাবা!’

‘রান্নাঘরে গিয়ে খেলে হয় না?’

উৎপলা ডান হাতের চাঁটি মেরে বাঁ গালের জুলপির ভেতরে একটা মশা না কী পিষে ফেলে বললে, ‘কুড়ি টাকা ভাড়া চাচ্ছে, ঝনাৎ করে টাকাটা ফেলে দেবে, না কি ফড়ের মত কথা বলছ তুমি । রন্নাঘর হয়ে এসেছ কোনোদিন?’

‘না, কী আছে ওখানে?’

‘আমার বাজু আছে আর তোমার পায়ের মল ।’

এক সারি নোংরা দাঁত কেলিয়েই মুখ বুজে ফেলল তৎক্ষণাৎ মাল্যবান; হাসল এক ঝিলিক, না, নাক সিঁটকাল, বুঝতে পারা গেল না ।

ছাদের উত্তরের দিকের ঘরটা ভাড়া করা গেল । চুনকাম করা ধবধবে সুন্দর দেয়াল, নতুন সবুজ রঙ মাখানো জানলা দরজা–দিব্যি ।

‘তোমার মেজশালার তো কলকাতায় আসবার কথা; যদি আসে, তা হলে এই ঘরটায় আমি মনু থাকতে পারি–বড়ঘরটা তাদের ছেড়ে দিতে পারি–’

মাল্যবান ঠোঁটের ওপর ছাঁটা গোঁফের গ্যাঁজে আঙুল বুলিয়ে কথা ভেবে নিচ্ছিল, কোনো উত্তর দিল না ।

আপাতত একটা লম্বা টেবিল এই ঘরটার মাঝখানে এনে রাখা হল–চারদিকে তিন–চারটে চেয়ার । সকালের চায়ের থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া–অব্দি সবই এই টেবিলে চলছিল ।

উৎপলা একদিন একটা চিলতি চিঠি পড়তে–পড়তে বললে, ‘মেজদা আসবেন ।’

‘কবে?’

‘আসতে অবিশ্যি দেরি আছে ।’

'এ–মাসে?'

চিরকুটটা রেখে দিয়ে উৎপলা বললে, 'মাস দেড়েকের মধ্যেই; পরিবার নিয়ে।'

'মেজশালার ছেলেমেয়ে কটি না?'

'তিনটি।'

'তিনটিই তো বেশ বড়–বড়।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে জায়গার টানাটানি হবে তো।'

'ঐ খাবার ঘরটায় গিয়ে আমরা থাকব।'

'তুমি আর মনু?'

'আমরা দুজনে তো বটেই,' উৎপলা সমীচীন কচ্ছপের চামড়ার মত কঠিন একটা ভাব দেখিয়ে তবুও বললে, 'তুমিও আসতে পার, দেখি কী হয়।'

মাল্যবান খুব আগ্রহে একটা কথা পাড়তে গিয়ে নিজেকে শুধরে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'অতটুকু ঘরে তিনজন কী করে আঁটবে?'

'তা আমি বন্দোবস্ত করে দেব। দুটো খাট পাড়লেই তো আমাদের তিনটি প্রাণীর হয়ে যায়। আমাদের একটা সেলের মত ঘর হলেই হয়ে যায়। দেখেছ তো দমদম জেলে।'

সত্যাগ্রহের আসামী মনে করে একটা বিশৃঙ্খল ভিড়ের ভেতর থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে মাল্যবান ও উৎপলাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখা হয়েছিল–দিন দুই–মাস ছয়েক আগে।

'দেখেছি তো,' মাল্যবান বললে, কিন্তু দোতালার বড়ঘরটায় এতদিন মাল্যবানকে চৌকি–একটা ক্যাম্পখাট অব্দি, পাততে দেওয়া হয় নি কেন? না হোক, উৎপলার অত বড় খাটে মাল্যবানকে শুতে দেওয়া হয়নি কেন?

মাল্যবান নিজের দাম্পত্যজীবনের আকাশপ্রমাণ ব্যর্থতাকে তিলপ্রমাণের ভেতর মজিয়ে এনে তিলের ভেতরে তবুও ব্রহ্মাণ্ড দেখতে–দেখতে একটু বিষণ্নভাবে হেসে ভাবছিল, কাঁকড়েশ্বরী, পরমেশ্বরী জেলে তো ক্যাঁকড়ার গর্তেও আমাদের এঁটে গেছে। তোমার মেজদা এলে খাবারের ঘরটায়ই হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আর আমি শুধু থাকি যখন এ–বাড়িতে, দোতালার এ বড় ঘরটায় আমার জায়গা হয় না কেন, নীচের ঘরে বকনাবাছুর রামছাগলের কান টানে, কান-টানের না প্রাণ-টানের খুঁটে আমাকে না বেঁধে রাখলে আমার রাখালি ঘুমটা পাকে না বুঝি ওপরের তলায়?

ঠিক হয়ে গেল ছাদের উত্তর দিকের খাবারের ঘরে এরা তিনজনে থাকবে, বাকি দুটো বড়–বড় ঘরই মেজদা আর তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে ।

'মেজবৌঠান মানুষ মন্দ নয়' উৎপলা বললে, 'কিন্তু আমি ভাবি, মেজদার জন্যে । মেজদা একটু সুখী মানুষ কি না–'

'পদ্মার ইলিশের মত সুখী বটে তোমার মেজদা ।'

'কী রকম?'

'সূর্যের একটা ঝিলিক দেখলেই লাট খেয়ে পড়ে মাছ–'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে' উৎপলা বললে, 'আমি যা বলছিলাম, একটা আড়ে–দিঘে প্রমাণ ঘর নিজের জন্যে না পেলে মেজদার চলবে না ।'

মাল্যবান বললে, 'ঐ দোতলার বড় ঘরটায় তিনি একাই থাকবেন বুঝি? ঘরটা বেশ বড়–আলো–হাওয়াও খুব । থাকুন ।'

'ঐ ঘরটাই দেব দাদাকে–'

'তোমার বৌঠান থাকবেন কোথায়?'

'তিনিও ঐ ঘরেই ।'

'তোমার দাদার সঙ্গেই?'

'শোন কথা, রামকানাইয়ের সঙ্গে তবে?'

'মেজদি তো নীচের ঘরে থাকলেও–'

'বৌঠান নীচের ঘরে থাকবেন? কেন? তোমার খচখচ করছে কোথায়?

মাল্যবান বললে, 'যে–রকম সুখী মানুষ তোমার দাদা, তাতে একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা যদি করেন বৌঠান, তাহলেও সারাটা দিন দাদা তো তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারেন, কিংবা তিনি দাদার কাছে এসে বসতে পারে । এতে তো কোনো অসুবিধে হয় না কারু–'

'কিন্তু রাতের বেলা?'

'তখন অবিশ্যি যে যাঁর ঘরে গিয়ে শোবেন ।'

'তা হয় না ।'

'কেন?'

'বৌঠান কাছে না থাকলে মেজদার ঘুম হয় না । এ নিয়ে মেজদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ঠাট্টা করে ।'

'ঠাট্টা চলে বটে ।'

'কী রকম?' বললে উৎপলা । তার মুখের আত্মতুষ্টির ঝিলিক নিভে গেল ।

'কোনো অসুখ আছে মেজদার?'

'কিছু নেই ।'

'সুস্থ মানুষ?'

'মেজদা–মেজদি দুজনেই । ওরা এক জোড়! প্রথম থেকেই হয়ে এসেছে । তুমি এখন ভাঙবে?'

'খুব ভাল শাঁখার ব্যবসায়ী ছিলাম আমি,' মাল্যবান একটু হেসে বললে, 'তোমার হাতও ননীর মতন নরম ছিল, কিন্তু কোনো শাঁখাই পরাতে পারলাম না কেন?'

মাল্যবানের কথা উৎপলার কানে অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের স্বগতোক্তির মত শোনাল; ও–রকম গোপনীয়তার ছায়া মাড়াতে চাইল না সে । শোনে নি যেন মাল্যবানকে, নিজেরই কথার জের টেনে উৎপলা বললে, 'এক চিলতি চিঠি এসেছে তো মেজদির কাছ থেকে পণ্ডিচারির থেকে । দেড় মাস পরে পণ্ডিচারির থেকে আসবেন মেজদা–মেজদি; ছেলেমেয়েরা পণ্ডিচারি নেই–কাছেই আছে–সেখান থেকে তাদের কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন । আমাদের বাড়িঘর চুনকাম করিয়ে নিলে কেমন হয়?'

মাল্যবান চুপ করে ছিল; তার খুব তাজা কথাটার কোনো উত্তরই দিল না উৎপলা; কথাটা শুনেছে বলেও স্বীকার করল না ।

'জানালা দরজা সব আগে থাকতেই বেশ রঙ করিয়ে নিলে ঠিক হবে,' উৎপলা বলল ।

'আমাদের নিজেদের খরচে?'

'তবে আবার কার খরচে? বাড়িওয়ালার?'

'না, না, সে তো তাকিয়ে–তাকিয়ে দেখবে আর হাসবে ।'

'হাসবে?'

'জামাই-এর শালা আসছে বলে শালার বোনাই গরাদে রঙ মাখাচ্ছে; হাসবে না ।'

চুনকাম রঙ করিয়ে নিতে খরচের ঠ্যালা আছে । ও–সব জিনিসের দরকারও নেই এখন । দেয়ালগুলো বেশ পরিষ্কার, দরজা–কাপাটও খারাপ নয় । এ–সব জিনিস নিয়ে মাথা খারাপ করবার মত বেশি টাকার রস মাল্যবানের নেই এখন, কিন্তু উৎপলাকে কিছু বলতে গেল না । বললে, বুঝবে না । মেজদা এলে তাঁকে দিয়ে বলালে বুঝবে বটে কিংবা মেজদিকে দিয়ে; তাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে; প্লাগ–টাগও বেশ ভালই কাজ করছে তাদের অন্তরেন্দ্রিয়ের এঞ্জিনের । বেশ চমৎকার দাম্পত্যজীবনই জমিয়ে বসেছে বটে মাল্যবানরা; কুয়াশার ভেতর থেকে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে যেন উৎপলার দিকে তাকিয়ে রইল মাল্যবান ।

'তা হলে এরা দুজনেই এই বড়ঘরে থাকবে শোবে?'

'হ্যা ।'

'আর ছেলেমেয়েরা?'

'নীচে শোবে ।'

'একা–একা নীচে থাকবে?'

'দরজা–জানালা বন্ধ করে দিলে ভয় নেই কিছু ।'

'মাল্যবান কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি গিয়ে সেখানে শুতে পারি না?'

'ছেলেপুলেদের মধ্যে?'

উৎপলার মুখের অসাধ দেখা দিল সময়ের শূন্যতার ভিতর একটা ছ্যাঁদার মত যেন ।

'না, অত আঁটবে কী করে? অত ঘুজিঘুজিতে ওদের কষ্ট হবে ।'

'তা হলে তুমি তো পার শুতে ওদের সঙ্গে', মাল্যবান বললে ।

'আমি অবিশ্যি শুতে পারি গিয়ে । তাই করতে হবে হয়তো । বৌঠান তো রাত হলে ওপরের থেকে আর নামতে পারবেন না ।'

একট কীর্তনের সুর গাইতে–গাইতে উৎপলা ছাদের দিকে চলে গেল । মাল্যবান খানিকটা হতচকিত, আড়ষ্ট, তারপরে অবহিত হয়ে অনেক্ষণ ঘরের ভেতর বসে রইল; দুটো কীর্তন সাঙ্গ হল; তারপর মাল্যবানের বাঁশ–বনে–ডোম–কানা ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি । কীর্তন শুনে অবিশ্যি নয়! এমনিই ।

একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে সে গোলদিঘির দিকে চলে গেলে ।

দিঘির চারপাশে পাক খেতে–খেতে সে অনেক কথা ভাবল, তারপর বেশি কথা ভাবতে–ভাবতে চারদিকের নটেগাছগুলোকে ঠুঁটো হয়ে মুড়োতে দেখে একটা বেঞ্চিতে এসে চুরুট জ্বালাল ।

দু–তিনদিন পরে মাল্যবান বললে, 'তোমার মেজদারা তো থাকবেন অনেকদিন ।'

'হ্যাঁ ।'

'বছর খানেক?

'না, মাস ছয়েক ।'

'একটা কথা আমার মনে হয়', মাল্যবান বললে, 'এ–বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন বাড়ি দেখলে মন্দ হয় না । দোতলা কিংবা তেতলায় বড়–বড় কয়েকখান ঘর থাকবে ।

শুনে উৎপলা নাকে–চোখে খুব খুশি হয়ে বললে, ‘তা হলে তো খুব ভাল হয়।’ গুনগুন করে গাইতে–গাইতে বললে, ‘তুমি সে–রকম বাড়ি দেখেছ কোথাও?’

‘না।’

‘পাওয়া বড্ড শক্ত।’

‘আমি খুঁজছি।’

‘পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পেতে হবে তো?’

‘ধরো, গোটাদশেক বেশিই না হয় দিলাম।’

কয়েক দিন পরে মাল্যবান এসে বললে, ‘একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।’

‘কোথায়?’

‘পাঁথুরেঘাটার দিকে।’

‘বাবা, অদ্দুরে গেলে?’

‘কিন্তু বাড়িটা বেশ।’

‘কটা ঘর আছে?’

‘পাঁচটা। দোতলায় চারটে, তিনতলায় একটা।’

‘বেশ বড়?’

‘হ্যাঁ।’

‘কত চায়?’

‘পঞ্চাশ।’

‘তা পঞ্চাশ টাকা বড্ড বেশি।’

‘কিন্তু পাঁচটা ঘর।’

‘তা বুঝলাম–’

‘ঠোঁটে পানের রঙ শুকিয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল উৎপলার ঠোঁট। ঠোঁট নেড়ে সে বললে, ‘কিন্তু মেজদার কাছ থেকে কিছু তো চাওয়া যায় না।’

‘তা আমি জানি।’

‘এমন–কি সেধেও যদি কিছু দেন, তা হলেও তা নিতে পারি না আমরা।’ সে–বিষয়ে মাল্যবানের খানিকটা মতভেদ ছিল।

একটা হাই তুলে মাল্যবান বললে, 'তাই তো, আড়াই শ টাকায় চলে কী করে, পঞ্চাশ টাকাই যদি বাড়িভাড়ায় দিয়ে ফেলি–'

উৎপলা চাপা গলায় ভরসা দিয়ে বললে, 'চালাতে পারি আমি অবিশ্যি–'

'নাঃ, সে আর তুমি কী করে পার! লোকও তো কম নয়–'

'তোমার সোনার ঘড়িটা যদি বিক্রি করে ফেল, তা হলে টেনে–মেনে এক রকম চলে–'

'আমার সোনার ঘড়িটা বিক্রি করে ফেলব!' মাল্যবান দম ছাড়বার আগে, দম ছাড়তেই পারবে না যেন সে আর, এমনি ভাবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'ঐ, বিয়ের সময় যেটা পেয়েছিলে–' মাল্যবানের মুখের দিকে তাকিলে বললে উৎপলা।

কিন্তু মাল্যবানের আর–এক রকম–কেমন যেন, পাট ভেঙে গেছে, এই চিল এই এখুনি ইস্ত্রি লাট হয়ে গেছে– এরকম মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী লাগল উৎপলার–বিরক্তি বোধ করল সে।

'বাবা তিনশ টাকা দিয়ে তোমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন। সেই বাপের জন্যে আমি তোমাকে বিক্রি করতে বলছি, আমার ভাইয়ের সুবিধের জন্যে এ না করে এ–ঘড়ি দিয়ে কাঁচাপোকা টিপ পরবে তুমি!'

'আয় রোদ্দুর হেনে ছাগল দেব মেনে'–র মত একটা বিলোড়িত মন্ত্রে যেন উৎপলার চোখ রৌদ্রের মত হেনে পড়ল মাল্যবানের চোখে' কথা বলতে–বলতে এগুতে–এগুতে মাল্যবানের মুখের ওপর প্রায় পড়ল গিয়ে উৎপলা। আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল, পরটা–চা খাবার জন্যেও ফিরে এল না আর মাল্যবান।

খানিকক্ষণ পরে মনু নীচের থেকে ফিরে এসে বললে, 'বাবা বেরিয়ে গেছেন, মা।'

'চা না–খেয়েই গেল যে,' বলে চায়ের বাটিটা একটু কাতকরে চাটুকু ছাদের এক কিনারে ঢেলে দিল।

মনুকে বললে, 'পরটা খাবি?'

'না, মা, আমার কেমন অম্বল হয়েছে।'

'এতটুকু বয়সেই তোদের অম্বল হয় শুনলেও হাসি পায়,' পরটা দুটো ছাদের ওপরে গোটা তিনেক কাকের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল উৎপলা, মনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'অম্বল! কথাটা শেখাল কে তোকে–'

'বুক জ্বলে যে।'

'তাকে অম্বল বলে তা ঠিক। কিন্তু কার কাছে শুনলে?'

'কেন তোমরাই তো অনেক সময় বল।'

'আমি বলেছি?'

মনুর দিকে চোখ শানিয়ে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'আমার বাপের বাড়ি কারো কোনোদিন অম্বল হয়েছে যে, বলবে?'

মনু চুপ করে রইল।

'ঠিক করে বল তো কোথায় শুনেছিস কথাটা?'

'ধ্যাৎ আমার অত মনে নেই–'

'মনে নেই। এলি গেলি, বাপের বিদ্যেয় বর্তালি, মনে নেই। যেমন দেখতে, তেমন লিখতে, কী যে বাপের গোঁই পেয়েছ বাছা।'

মাল্যবান যতই অভিমান করুক না কেন, রাতে খাবার সময় ঠিক হাজির হল। উৎপলা তিন জনের ভাত সাজাতে–সাজাতে বললে, 'তোমার বড্ড ক্ষুদে মন–ক্ষুদিরামের মত–ফাঁসির ক্ষুদিরাম নয়–ভারি নচ্ছার মন তোমার–'

'আমার?'

'চা না–খেয়ে বেরিয়ে গেলে যে বড়?'

'ওঃ–চা–' মাল্যবান নাকের ভেতর দিয়ে খানিকটা হাসল– যেন কিছুই হয় নি; চায়ের কথাটা কিছুই মনে ছিল না যেন তার।

'চা পরাটা পড়ে রইল–শেষে কুকুর–বেড়ালে খায়–গতর খায় গতরখেকোর রাগ।'

'না, না, রাগ নয়–খাবারের ওপর মানুষে আবার রাগ করে না কি–অত আহাম্মক আমি নই!' বলে মাল্যবান বুদ্ধিমান নিরাগীর মত ভাব দেখিয়ে পাঞ্জাবির আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বললে, 'দেখি ভাতের থালাটা–'

উৎপলা ছুড়ি দিয়ে একটা লেবু কাটতে–কাটতে বললে, 'আহাম্মক হবার বাকিও রাখ নি কিছু–'

মনুর মাথায় একটা চাঁটি মেরে উৎপলা বললে, 'ট্যালার মত এই খাবারের জিনিসগুলোর কাছে থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছিস যে! হাভাতে মেয়ে, বোস গিয়ে–ট্যাক–ট্যাক করে তাকিয়ে আছে। গুষ্টির খাঁই এখন থেকেই দমকে–দমকে চাড় দিয়ে উঠছে পেটে।'

মাল্যবানের ইচ্ছা হচ্ছিল এবারও সে উঠে যায়। কিন্তু কারো শিক্ষা হবে না। যে যা হবে না, তাকে তা করা যাবে না। মাঝখানে না খেয়ে উঠে গেলে খিদের পেটে নিজেরও কোনো লাভ হবে না। মাল্যবানের সঙ্গে উৎপলা যদি টিকে থাকে মাল্যবানের মৃত্যু পর্যন্ত–এই রকম ভাবেই টিকে থাকবে; কোনো সংশোধনী বিজ্ঞানী বিদ্যে নেই এ–সব স্ত্রীলোকদের শোধরাবে–আমেরিকা বা রাশিয়ার হাতেও; কোনো লক্ষ কোটি অব্যয় কাল নেই ব্যক্তি মানুষের হাতে কয়লাকে যা হীরে করে দিতে পারে।

মনু চেয়ারে এসে বসল বাপের মুখোমুখি। মাল্যবান তাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভরসা পাচ্ছিল না। মেয়েটির দিকে তাকাতেও গেল না। মেয়েটির পাশে বসে আছে–কেমন কানাভাঙা খোনা খেমটা উত্তেজের অবসাদে মাল্যবানের মত ভারি হয়ে উঠতে লাগল। নিজে সে বাপ হয়েছিল–বিয়ে করেছিল–হীন কুৎসিত উচ্চুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল ভাবতে–ভাবতে মন তার চড়–চড় করে উঠল। একটা পাখি সৃষ্টি করে তাকে যদি হাঁদারার অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়– কেমন ছটফট করে উঠতে লাগল মাল্যবানের ভেতরটা। মাল্যবান ভাবছিল : উচিত ছিল তার একা থাকা, খবরের কাগজ পড়ত, অফিসে যেত, গোলদিঘিতে বেড়াত, সভা–সমিতিতে সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসত, বেশি করে যেত থিওজফির সভায়, ফ্রিম্যানস হত, রাত জেগে ডিটেকটিভ উপন্যাসের থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটির মিনিট, নানা রকম কমিশনের রিপোর্ট, ব্লু বুক, হাতের কাছে যা–কিছু আসত, তাই পড়ত, ভাবত, উপলব্ধি করত–কেমন চমৎকার হত জীবন তা হলে।

জীবনের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককে জড়িয়ে নিয়ে– এ জড়িয়ে নেওয়ার সমস্ত নিহিতার্থের ছোব–পোচড়া গায়ে মেখে দধিতে কাদায় মূর্খতার ওগরানো অম্বলে আগুনে অতৃপ্তিতে মণ্ডিত হয়ে কী হল সে।

খানিকক্ষণ থালায়–বাটিতে চুপচাপ ভাত–ডাল–তরকারি সাজিয়ে উৎপলা পরে বললে, ‘ছোটবেলায় বাপ–মা তোমাকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিল বেশ–’

‘কেন, কী হয়েছে, কী দেখলে তুমি?’

‘নাহলে এ–রকম হ্যাংলামো কেউ করে?’

‘হ্যাংলামো?’ ভাতের থালাটা উৎপলার গায়ে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে কোন বৈষ্ণবী শক্তির জোরে যে বিরত হল মাল্যবান, দু–এক মিনিট খুন–চাপা রক্ত–চড়া মাথায় কিছুই বুঝতে পারল না সে।

আস্তে–আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছিল তার মন।

‘তা নয় তো কী–’ উৎপলা বললে।

‘কী করেছি আমি?’

‘খুব যে অস্তিন টেনে ভাতের থালা কিলিয়ে পাকাচ্ছিলে–দেখছিলেই তো ভাত–ডাল–তরকারি মাছের বাটি তখনো তৈরি হয় নি। ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল, এখনও ন্যালা কুকুরের মত খুব যে গুঁই–গাঁই–খুব যে গুঁই–গাই!’ মাল্যবানের এক রাশি কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খুব অল্পে সেরে দিয়ে সে বললে, ‘আমার খিদে পেয়েছিল, থালাটি চেয়েছিলাম তাই।’ খিদে তো ঘোড়ারও পায়; তাই বলে মানুষের টেবিলটাকে আস্তাবল করে তুলতে হবে,’ ভাতের থালাটা মাল্যবানের দিকে ঠেলে দিয়ে উৎপলা বললে, ‘কুড়ি–পঁচিশ পেরিয়ে গেলেই সব কাপ্তেনি ফুরিয়ে যায়–ব্যাটাচ্ছেলেরা দিব্যি পুরুষ মানুষ হয়ে

ওঠে–দিব্যি। সতের–আঠার বছর বয়সেই মেয়েরা স্ত্রীলোক হয়–কিন্তু বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও ঢেস্কেলে কী থাকবে আর, ঢেঁকি ছাড়া?'

মাল্যবান ঘাড় ঝুঁকিয়ে খানিকটা দক্ষিণায়নে রেখে খাচ্ছিল।

উৎপলা এক গেরাস মুখে তুলে বললে, 'কপালে যদি হবার নয় লেখা থাকে, তা হলে সে–লেখা কপালের ঘামে মুছে যাবার নয় তো, ও–সব লেখা ঘামে–রক্তে মোছে না।'

মনু বুঝছিল না বিশেষ কিছু; মাল্যবান বলছিল না কথা কিছু; খাবার ঘরে নিস্তব্ধতা খানিকক্ষণ; যে যার মনে নুন মাখিয়ে, লেবু টিপে, জলের গেলাশ মুখে তুলে, তরকারির বাটি কাত করে খেয়ে যাচ্ছিল।

'কিন্তু অফিস থেকে এসে কী হয়েছিল শুনি?' বললে উৎপলা; গায়ের ঝালটা কিছুতেই মরছিল না যেন তার।

মাল্যবান খাওয়ার ধরন–ধারণ খানিকটা বদলে ফেলে একটু ভদ্রভাবে খেতে–খেতে বললে, 'কিছু হয় নি।'

'ঝপ করে অমনি মিথ্যে কথা।'

'কী হবে আবার।'

'চা না খেয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল যে।'

'চা আমি বাইরে খেয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'দোকানে।'

'কে খাওয়াল?'

'কে খাওয়াবে আবার–'

'গাঁটের পয়সা ভেঙে খেলে তো?'

'সেই রকম খেতেই আমি ভালবাসি–'

'তোমার বন্ধুদেরও আশান হয়। কে আবার ট্যাকের পয়সা খরচ করে ডিমের বড়া খাওয়াবে ধরা–গণেশকে, 'উৎপলা বললে, 'পয়সা খরচ করে তারা– খুব খরচ করে– কিন্তু মানুষ বুঝে–মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে–'

উৎপলা কঠিন নিঃশ্বব্দ দৃষ্টিতে মাল্যবানের আপাদমস্তক কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করে দেখল।

'এক পেয়ালা চা নিয়ে সাধে না; কেন, ঘরের বাইরে জলচল নেই তোমার?'

'চা নিয়ে সাধে না বাবাকে', মনু বললে, 'দই–মিষ্টি?'

মাল্যবান নিঃশব্দে আলু টিপছিল।

'আহ্বান যা আসে তাও শ্বশুরবাড়ির থেকে। লোচনা ডোমেরও জামাই ষষ্ঠী হয়–সেই রকম আর–কি। বেয়াল্লিশটা বছর বসে এত বড় পৃথিবীর ভেতরে থেকে মানুষ সমাজে মানুষটা কানা–একেবারে ছুঁচো–চামচিকের পারা–'

উৎপলা খানিকটা জলে গলা ভিজিয়ে নিল, 'কোথাও ডাক নেই, কেউ পোঁচে না, হৈ–হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা–মজলিশ নেই–খোল–করতাল কেত্তন–মুজরোর বালাই নেই–কোনো মানুষই আসে না–ডাকলেও আসে না। কিন্তু বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে? ড্যাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে?

মাল্যবান খাচ্ছিল। মনু শুনছিল, হাসছিল, ভুলে যাচ্ছিল, মানে বুঝছিল না, ফেলাছড়া করে অরুচি মুখে মাঝে–মাঝে আবার খুঁটছিল খাচ্ছিল–'

'সেই বিয়ের পর থেকেই দেখছি কেরানিবাবুর নীচের তলায় ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন, আর একটাতেও নিজে বসেন। হাফ–আখড়াই কে যেন আসত মাঝে–মাঝে–ওঃ অভিরাম সরখেল; হামলা হচ্ছে বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।'

একটা ঘোলা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা। কিন্তু ব্যথাটা লাগল মাল্যবানের বুকে গিয়ে বেশি–বন্ধুবান্ধব নেই বলে নয়–মাল্যবানের জীবনের নিঃশব্দতার খানিকটা যে সূক্ষ্ম মানে আছে, তার উপর এরকম খিঁচুনি–খোঁচা এসে পড়ল বলে। অথচ উৎপলা মেজাজে থাকে না যখন আর, স্থির হয়–তখন আজীবন যে–সব বিচিত্র বেচাল কথা বকে গেছে সে সবের বেকুবি তাকে নিঃশব্দ করে রাখে–এমনই নিঃশব্দ মনে হয় যেন সমুদ্রের ওপারে পৃথিবীর পারে সকলের নাগালের বাইরে অন্তহীন 'হচ্ছি' 'হব' পেরিয়ে কেমন শাশ্বত 'হয়েছি'র নিবিড়তার ভেতর বসে আছে সে। কিন্তু এখন অন্য রকম উৎপলার, দুঃখের বিষয়, এইটেই তার আটপৌরে রকম।

একটা কাছের রেকাবি থেকে এক টুকরো লেবু নিয়ে ডালের সঙ্গে টিপতে–টিপতে অসাধ অসফলতার বাহনের মত কেমন একটা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা, নিশ্বাসটা নিজের নিয়মে ঠিক–এত নিরাভরণ ভাবে ঠিক, যে মনে হয় অনেক অতল থেকে উঠে এসে নিজেকে মোটা ব্যবহারে খরচ করবার আগেই মিলিয়ে যায় সে; শুনলে মানুষের প্রাণ কেঁপে ওঠে।

পাতের কিনারে কাঁচা লঙ্কাটা ফেঁড়ে–ঘষে ডালের স্বাদ বাড়াবার চেষ্টা করতে গেল না মাল্যবান আর। খাওয়া এখন অপ্রাসঙ্গিক। এই নারীটিকে নিয়ে কী করবে। উৎপলার এই সব ফাড়ন–ফোড়ন, শূন্যতা, দীর্ঘশ্বাস, আড়াআড়ি মাল্যবানের নিস্ফলতা ও অব্যয় নিশ্বাস (মাল্যবানের মারাত্মক কফের মত বুকের

ভেতর বসে গেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই, উৎপলা কোনো সময়ও টের পায় না) ঘরদোরের নিশ্চুপ বাতাসে ঘাই মেরে ফিরছে। কী হবে এই বাতাস ঘরদোর দিয়ে। এই নারী নিয়ে কী করবে সে।

'যে দু–চারজন লোক তোমার কাছে আসে, তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারা যায় না।'

'কেন?'

'দেখতে তারা খুব খারাপ নয়, কিন্তু চুনো গন্ধ আসে রক্তের ভেতর থেকে। কোনো বিহিত–টিহিত নেই।'

'জানি না।'

'আমি তাদের সেঙ্গ কথা বলি না তাই।'

'মানকচুর পাতার আড়ালে বসে আমার সেঙ্গ কথা বলে ওরা। তোমাকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে হয় ন।'

উৎপলা বললে, 'মানকচুর পাতার আড়ালেই বর্ষাকালটা তোমার জমে বেশ দু–চারটে ক্যাকড়া চড়িয়ে। ওদেরই মত তুমি। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

'কী হবে আলাপ করে?'

'আমি তা জানতাম। তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে আমি যা ভাবি, পরের স্ত্রীরাও হয়তো তোমার সম্বন্ধে সেই কথাই ভাবে,' বলে উৎপলা এঁটো হাত দিয়ে জলের গেলাশটা ঘাঁটতে–ঘাঁটতে বললে, 'ছি, কী ঘেন্না।'

'না, এমন ঘেন্নার কিছু নয়–আমাদের দুজনের জীবন দুই রকম, এই যা।'

'এত বড় পৃথিবীতে একজন মেয়েলোকও তোমার সঙ্গে খাতির করা দরকার মনে করল না, না ভালবাসা, না স্নেহশ্রদ্ধা, না মমতা–সহানুভূতি–কোনো কিছুই কেরানিবাবুটিকে দেবার মত নেই কারো। ওঃ, আমার একারই বুঝি দিতে হবে সব। লক্ষ্মীর ঝাঁপি!' উৎপলা বললে। বলতে–বলতে বলার মাথায় উৎপলা গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'একজন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসত না আমার–'

শুনে মাল্যবান চমকে উঠল না, হেসেও উঠল না; খিদে ছিল; মাল্যবানকে খেতে না দিতে চায় না উৎপলা; কিন্তু অবস্থা তো এই রকম। টেবিলে যা জিনিস আছে, তাতে চার–পাঁচ জনে খেতে পারে, কিন্তু মনু নিজেরটুকুই খেয়ে উঠতে পারছে না; আর দুজনের তো খাওয়া বন্ধ; চমৎকার কবিয়ালি লড়াই শুরু করেছে সময় বুঝে তারা।

টেবিলে মাথা রেখে মনু ঘুমিয়ে পড়ছিল। মাল্যবান একটা লেবুর খোসা নিয়ে আঁক করছিল থালার ওপর চুপচাপ।

'আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, বাধ্য হয়ে অনেক কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হয়—'

মাল্যবান লেবুর খোসা দিয়ে থালার ওপর স্বস্তিকা আঁকছিল—একটা-দুটো-তিনটে—কোনো কথা বললে না।

'বিশ্বাস—অবিশ্বাসের ব্যাপারে সব মানুষই স্বাধীন—কিন্তু এমন পাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েচি যে সে—স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছি—'

'বাধ্য হয়ে কী বিশ্বাস করতে হয় তোমাকে?'

'এ বিয়ে আমার হত, কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না, এই বিশ্বাস—'

'ওঃ, এই বিশ্বাস—' থালার স্বস্তিকাগুলো মুছে ফেলে জেঙ্গিস খাঁর নিশানের বারটা পুচ্ছ—ইয়াকের উদ্যত পুচ্ছ, আঁকবার চেষ্ট করছিল মাল্যবান।

'কিন্তু এটা সংস্কার,' উৎপলা বললে, 'সত্য নয়। কিছুতেই সত্য নয়।'

'যেন গ্যালিলিও বলছে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা চৌকো, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না পৃথিবীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেঙ্গিসের ইয়াকের লেজ আঁকতে—আঁকতে একবার মুখ তুলে অবনমিত গ্যালিলিওর দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত লাগল মাল্যবানের—কেমনে একটা আভা যেন উৎপলাকে ঘিরে—বিজ্ঞানের পরাসত্যের জন্যে তপস্যা করছে সে—সংগ্রাম করছে।

'তোমাকে আমি না বিয়ে করেও পারতাম। সেইটেই সত্য।' উৎপলা বললে।

'আমারও তো তাই মনে হয়। পাখিটাকে ফাঁদে ফেলে সেই ফাঁদটাকে সত্য বলে নির্দেশ দেবার কোনো অর্থ হয় না। আকাশ সত্য নীড় সত্য পাখির আছে—'

উৎপলা এবার ভাত—তরকারির দিকে মন দিয়ে বললে, 'আমি তাই বলছিলাম—' দুই—এক গ্রাস খেয়ে সে বললে, ''অনুপম মহলানবিশকে তো বিয়ে করতে পারতাম আমি—'

লেবুর খোসা দিয়ে নখ দিয়ে জেঙ্গিসের ইয়াকলাঙ্গুললাঞ্ছিত নিশান এঁকে ফেলেছে মাল্যবান—বারটা লেজই এঁকেছে—থালার ওপর; চোখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'কে অনুপম মহলানবিশ?'

'ঐ রকম এক জন লোককেই বিয়ে করার কথা আমার। সেইটেই সত্য হত কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের মুখ দেখতে পাওয়া কঠিন।'

থালার ওপর জেঙ্গিসের লাঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'ওঃ, হ্যা, অনুপম মহলানবিশ; মহলানবিশের কথা শুনেছি আমি। অনুপম মহলানবিশ, ধীরেন ঘোষাল, নসু চৌধুরী—যেন বালেশ্বর যুদ্ধের, মেছোবাজার বোমার, কাকোরি মামলার, চাঁটগাঁ আমরামি রেডের শহিদ সব; কিন্তু তা নয়, এরা অন্য লোক, বিষয়ী লোক—এদের কথা আমাকে অনেক বার বলেছ তুমি। এদের কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক

হত, দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু তাই বলে, তুমি হিন্দুঘরের মেয়ে বলে যা হল না সেটা সংস্কার, যা হয়েছে সেটা সত্য–এটা তুমি না মেনে পারছ না বলছ?'

খাবার থালার থেকে মুখ তুলে উৎপলার দিকে তাকিয়ে মাল্যবান বললে, 'না মেনে পারছ না বলছ। কিন্তু সত্যিই মানছ না। তোমার রক্তের ব্যাধি–জীবাণুগুলো হয়ত মানছে, কিন্তু শ্বেতকণিকাগুলো মানছে না, তোমার আত্মা মানছে না।'

উৎপলা একটা ভাল নিশ্বাস ছেড়ে বলতে–বলতে গিয়ে বললে না কিছু। মাল্যবান পার্শে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত চটকে লেবুর নিংড়ে নিচ্ছিল, লেবুর খোসাটা ফেলে দিয়ে বললে, 'হিন্দু বৌদের বোঝাবে কে যে এর চেয়ে স্থির বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু নেই আর। এক হাজার বছর কেটে গেলেও বুঝবে কি তারা?'

মীমাংসাটা ভাল লাগল উৎপলার, বলল, 'টেররিস্ট বলত সবাই অনুপম মহলানবিশকে। ডাকগাড়ি রেলগাড়ি লুট, ব্যাঙ্ক লুট, আর্মারি লুট, কত কী করেছে অনুপম–কত জেলে পচেছে দেশকে স্বাধীন করতে; একাবর ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল অনুপমের কিন্তু কী করে তা বাতিল হল টেররিস্টদের দলে থেকে আমিও তা টের পেলাম না।'

জেঙ্গিস খুব বড় খাঁ ছিল, ভাবছিল মাল্যবান, দুর্দান্ত লোক ছিল মোঙ্গলগুলো, কিন্তু কারণকর্দমের ভেতর মৃণালের মত ছিল কুবলাই খাঁ।

'কই, কখনো বল নি তো আমাকে তুমি সন্ত্রাস–ষড়যন্ত্রের ভেতরে ছিলে।'

'বলে কী হবে,' উৎপলা বললে, 'এখন তো আর নেই। ছিলাম অনেক আগে।'

'ফাঁসি বাতিল হয়ে গেল অনুপমবাবুর? আন্দামান হল?'

'না'।

'তাও হল না? তা কী করে হয়?'

'তা ইন্ডিয়া–সেক্রেটারি বলতে পারেন। জেলও তো হল না।'

'জেলও হল না?' থালার ওপর থেকে সমস্ত লাঞ্ছনা মুছে ফেলে পার্শে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে–খেয়ে শেষ করে এনেছিল প্রায় মাল্যবান; থালাটা আবার পরিষ্কার হয়ে এসেছে প্রায়; আবার ছবি আঁকা যাবে–আর–এক জন বড় খাঁর বড় আঁকবে সে–কুবলাইয়ের ছবি।

'জেলও হল না, অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বোধ হয় অনুপমবাবুর?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল বলে তার জন্যে টান কমে নি তোমার?'

উৎপলা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুরি দিয়ে একটা লেবু কাটতে–কাটতে বললে, ‘টেররিস্টরা বলেছে অনুপম স্পাই ছিল। হয়তো ছিল। হয়তো ফাঁসি হল না বলে ঐ কথা বলেছে।’

স্পাই? মাল্যবান একটু বিলোড়িত হয়ে বললে, ‘সে তো অ্যাপ্রুভারের চেয়েও খারাপ। না কি অ্যাপ্রুভার স্পাইয়ের চেয়ে খারাপ। স্পাই?’

‘অনুপম স্বদেশী করছে, না স্বদেশীদের লাটের কিস্তিতে চড়াচ্ছে, সে সব ভেবে তাকে ভালবাসি নি আমি। সে স্পাই বুঝি?’ উৎপলা নিজের দৃষ্টির ভেতর থেকে কুয়াশা সরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার চোখে মাল্যবানের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু ঠাট্টা, বিষণ্নতা ছিটিয়ে হেসে বললে, ‘হবে স্পাই। অ্যাপ্রুভার হলে হবে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর নিয়ম আমার আর–এক রকম। জল নিয়ে কথা নয়, পুকুর, নদী, সাগরে, ঢাউস জল তো আছে; কিন্তু সেই জল কি আছে–ফটিক জল?’

না, তা নেই। অনুপম অ্যাপ্রুভার বলে নয়, অনুপম বলেই মেঘজল্ মাল্যবান মাথার উপরে খুব বেশি পাওয়ারের আলোটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে ভাবছিল, বাঙ্গালি হিন্দু পরিবারের উৎপলা আর সে রয়েছিল বলে দুজনের এই দাম্পত্য সম্পর্ক টিকল বার বছর। এই বারটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা–অরুচির বঁইচি–কাঁটা বেত–কাঁটার ঠাসবুনোন জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মত নাকেদমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুর ধাস্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির। কিন্তু সে–থাবার সামনে হরিণ বা বনগোরু না হয়ে রায়বাঘের মত রুখে দাঁড়ালে ময়ূরীর মত উড়ে যায় ডাল থেকে ডালে অদৃশ্য লোকের ঘরপাতার ভেতর কোনো এক জাদুর জঙ্গলে এই মেয়েটি; না হলে ময়নার মত পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকে– হলুদ ঠ্যাং দুটো আকাশের দিকে। জীবনটা আমার যা চেয়েছিলাম তা হল না, যা ভয় করেছিলাম তার চেয়ে বেশি ভয়ে, বেশি শোকে গড়িয়ে পড়ল– ভাবছিল মাল্যবান। কিন্তু আমি–ভেবে–চিন্তে–আমি পুরুষমানুষ একটা পথ কেটে নিতে পারি, কিন্তু একটা দার্শনিক প্রস্থানে আমি পৌঁছুতে পারি বলেই নয়,– এমনিই, উৎপলার জীবনের বিতিকিচ্ছিরি নিষ্ফলতা, ব্যথা আমি পাই নি। মনু ও উৎপলা খেয়ে মুখ ধুয়ে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল। মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালাল। খাবার ঘর ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে–ছাদের ওপর দু–মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, শীত রাতের আকাশের আগ্নেয় গুঁড়িগুলোকে এক নজরে একটা সুপরিসর চিলদৃষ্টির ভেতর কবলিত করে– উৎপলার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টানতে–টানতে চুরুটটা যখন বেশ জ্বলে উঠেছে, খুব ধোঁয়া উড়ছে, রাশি–রাশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাল্যবানের নাকমুখের ভেতর থেকে–মাল্যবানের মন কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, এখন আবার অবহিত হয়ে উঠল। দেখল স্ত্রীর ঘরের বাতি নিভে গেছে–চারিদিক

অন্ধকার; মশারি টাঙিয়ে উৎপলা শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছেও হয়তো। উৎপলার মশারির ভেতর লেপের ভেতর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল মাল্যবানের। কিন্তু এ–ঘরের চমৎকার শীত ও অন্ধকার ছেড়ে নীচেই যেতে হবে তাকে।

চুরুটের মুখে ছাই জমেছে, টোকা দিয়ে ঝেড়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালে টেবিলে চা খাওয়ার সময় উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'কাল চায়ের দোকানে কী খেলে?'

'চা আর বিস্কুট।'

'আর কিছু না?'

'না।'

'বাবা যে সোনার ঘড়িটা তোমাকে দিয়েছিলেন, তার দাম তিনশ নয়–চারশ টাকা, আমার নোটবুকে লেখা ছিল দামটা, দেখছিলাম। আজকাল সোনার দাম বেড়ে গেছে–হয়ত দুশ টাকায় বিকোবে। টাকাগুলো হাতে থাকলে–মেজদারা আসছেন–সুবিধে হত তাদেরও, আমাদেরও। কিন্তু তবুও তুমি তো নিজের ঢেঁকি ছাড়া পাড় দেবে না।'

উৎপলা এতক্ষণ চায়ে চুমুক দেয় নি। এবার চার–পাঁচটা চুমুকে আধ পেয়ালা চা শেষ করে পেয়ালাটা একটু সরিয়ে রেখে বললে, 'শুধু কি তাই, ঘড়িটা তোমাকে বেচে দিতে বলেছিলাম, তাই রাগ করে চায়ের দোকানে গিয়ে খেলে। এ আবার কী রকম–হিগলে পিগলে–হিগলে পিগলে–মেয়ে–মানুষের মত নোলা ছব–ছব করছে ঘড়িটা বিক্রি করার কথা পেড়েছিলাম বলে–এ আবার পুরুষ? কী রকম পুরুষ তা হলে। এ সব পুরুষ মানুষের ভরার মেয়ে বিয়ে করা উচিত।'

ঠাণ্ডা শান্ত করুণ ভাবে কথা বলছিল উৎপলা। একটা চাপা ঝাঁঝ যে না ছিল তা নয়। মাল্যবানের চোখে ভাব এল ঃ উৎপলার হৃদয়টা বাস্তবিকই বেশ, ভাইয়ের জন্যে এই সুচিন্তাটুকু আগাগোড়াই সৎ; আমার বদলে অন্য কোনো মানুষকে–উৎপলার শাদা রক্তকণিকা যাকে চায়, তাকে যদি পেত সে, তা হলে নারীটির মনের প্রাণের স্পষ্ট প্রবণতাগুলো শত পথ খুলে যেত যেন–সরলতায়, সরলতায়–

ভাবতে–ভাবতে মাল্যবান চোখ বুজে কেমন একটা শামকল পাখির মত মুখে নিগূঢ় হয়ে বসে রইল; অনেক মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে যার, সোনার ঘড়িটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না সে। নিজেকে যে এই রকম দেখাচ্ছে তাও টের পেল মাল্যবান।

'আমার সোনার নেকলেসটাই বিক্রি করতে হবে। বাপের বাড়ির মানুষদের আমাদের রকম এই যে, দশ জনের কাজে লাগলে কোনো জিনিসকে পুঁজি করে রাখি না আমরা–ছড়িয়ে দিই চারিয়ে দিই। কিন্তু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি। বার বছর বাপের ঘর ছাড়া। গোরুর মুত লেগেছে দুধে–কেন কাটবে না?'

মাল্যবানের ভাবপ্রাধান্য–যা তাকে আবেশ দিয়েছিল–সময় মত ভাটার টানে সেটা পড়ে যাচ্ছিল আবার; উৎপলা যা বলছিল, কিছু তার কানে ঢুকছিল শব্দতরঙ্গের মত; মন উৎকর্ণ হয়েছিল–উৎপলা নয়, মাল্যবান নিজেও নয়, কিন্তু মাল্যবানের মনের অবচেতনা নির্ঝুমের দিকে; কি বলছে সে? ঘড়িটা বিক্রি করো না, ঘড়িটা বিক্রি করো, করো না বিক্রি, করে দাও; করো না করে দাও, করে দাও। ঘড়িটা কি আজ বিক্রি করেছে সে? প্রায় তিন বছর আগে উৎপলারই একটা টাকার খাঁই মেটাবার জন্যে বিক্রি করতে হয়েছিল ঘড়িটাকে। খুব ভাল করেই জানত সে। কিন্তু তবুও না–জানবার ভান করে–সোনার দর বাড়লেই সেই সোনার ঘড়িটাকে বিক্রি করবার জন্যে তোলপাড় করে; অন্য কোনো মানিকজোড়ের থেকে বিচ্ছিন্ন পাখিনীর মত এমনই বিজোড় এই মেয়েমানুষটি মাল্যবানের জীবনে।

হাতে আর–একটা ঘড়ি আছে বটে মাল্যবানের, সেটা সোনার নয়। সেটা বিক্রি করাতে হবে? না তা ঠিক নয়। শ্বশুর যে সোনার ঘড়ি দিয়েছিল জামাইকে, সেটাই বারবার বিক্রি করে, শ্বশুরের ছেলে–পরিবারকে একটু তরিবতে রাখতে হবে মাল্যবানের বাড়িতে, শ্বশুরের মেয়ের বাপের টাকাতেই যে সব হচ্ছে, সে–উপলব্ধি নির্বিশেষে ভোগ করতে দিতে হবে শ্বশুরের মেয়েকে।

ব্যাপারটা এই রকম তো? একে কী বলে? পিতৃগন্থি? না কি, জোড়ভাঙা পাখি কূল পাচ্ছে না অথৈ শূন্যের ভেতর, তাই সামাজিক সাক্ষীগোপালটির চেয়ে ভাইকে নিকট মনে হয়–পিতৃগ্রন্থি সক্রিয় হয় ওঠে? না, তা ঠিক নয়, মাল্যবান ভাবছিল, কোনো বিজ্ঞানের ছকে ধরা যায় না। উৎপলা বিজ্ঞানাতীত।

পাথুরেঘাটার বাড়িটা উৎপলা নিজেই একদিন মাল্যবানের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে দেখতে গেল। দেখে পছন্দ হল না তার। অন্য কোনো বাড়িও সুবিধে মত পাওয়া যাচ্ছিল না। কাজেই ঠিক হল, মেজদার পরিবার এলে মাল্যবান নিজে কিছু কাল মেসে গিয়ে থাকবে।

মাল্যবান তার হাতের অবশিষ্ট ঘড়িটা, কতকগুলো সোনার বোতাম (লুকিয়ে রেখেছিল বাক্সের ভেতর) বিক্রি করে শ–চারেক টাকা উৎপলাকে দিল। সোনার নেকলেসটা তাই আর বিক্রি করতে হল না।

এইসব নানা ব্যাপারে উৎপলার মনটা খুশি হয়েছিল। এক দিন রবিবার সে মাল্যবানকে বললে, 'মনু অনেক দিন থেকেই বলেছে চিড়িয়াখানা দেখতে খুব ইচ্ছে করে তার। আমিও তো শিগগির যাই নি। চলো–না, আজ যাই।'

তিন জনে ট্রামে উঠল। খিদিরপুরের ব্রিজের কাছে এসে মাল্যবান তার পরিবার নিয়ে ট্রাম থেকে নামল।

'বাঃ, আলিপুর–বা কোথায়, তুমি পথের মাঝখানে নেমে পড়লে যে–'

'এই বাজারটুকুর ভেতর দিয়ে যেতে হবে, মিনিট তিনেকের পথ।'

খিদিরপুর বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে–হাঁটতে উৎপলা নাক সিঁটকে বললে, 'ছি, মুর্গি–খাসির বাজরের ভেতর দিয়ে–। কলকাতা শহরে কি আর–পথ ছিল না!'

মনু বললে, 'রামছাগলের বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, বাবা। ইস, কী পেচ্ছাপের গন্ধ, ছ্যাঃ! ঐ দেখ একটা ছাগল কাটছে–'

'ও–দিকে তাকিও না মনু–'

'আমাদের যদি একটি ছোট অস্টিন গাড়িও থাকত, তা হলে এই নালা–নর্দমা পচা কাদা আর মুতের গন্ধ কি আমাদের নাগাল পেত, মনু?'

'আমি বড় হলে বাবা গাড়ি কিনবে', মনু বললে।

'একবারে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াত,' উৎপলা বলল, 'সেইখানে নামতাম।' উৎপলা একটা নিশ্বাস ফেলল, কিন্তু এ–নিশ্বাসটা চিংড়ি মাছ ঠোকরালে ফাত্না যে–রকম করে নড়ে তেমনি হালকা আলতো উদ্দেশ্যহীন। চিড়িয়াখানার ভেতর ঢুকে উৎপলা বললে, 'এমন ঠাণ্ডা কেন গো, একেবারে হাড়গোড় কেঁপে ওঠে যেন।'

'শালের ভাঁজ খুলে ভাল করে জড়িয়ে নাও, গলা।'

'না, এ পাট করা শালটা হাতেই থাক। শাল গায়ে দেবার মত শীত দুপুরবেলা কলকাতায় কোথাও পড়েনি,' হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'এ–সব জিনিসের বাজে খরচ করতে হয় না। কেনই–বা এনেছিলাম, হারিয়ে যায় যদি।'

'আমার হাতে দাও।'

'না, থাক আমার কাছে।'

মনুর দিকে ফিরে উৎপলা বললে, 'বাঁদর দেখবি, মনু–'

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে উঠল, 'হ্যাঁ, দেখব।'

'তুই নিজেই তো একটা বাঁদর। তোকে এবার খাঁচায় আটকে রাখতে হবে। মনু, তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মালি রে।'

মাল্যবানকে বললে, 'চলো, বাঁদরের ঘরে যাই।'

গেল সকলে মিলে সেখানে ।

মনু বললে, 'দেখেছ মা, কলার জন্যে হাত পাতছে; মা, কিনে দাও ।'

'কলা দেবে না হাতি । যা খাচ্ছে, তাই হজম করে নিক ।'

'কেন, হজম করতে পারে না? অম্বল হয়?'

উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ জানোয়ারগুলোর মুখ তো নড়ছেই–নড়ছেই, পেটে আলসার টালসার হয় না?'

'কী জানি!'

মনু খুব অনুভবাক্রান্ত হয়ে বাঁদরের খাঁচাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল; হঠাৎ উৎপলা মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে টান মেরে বললে, 'তোকে এর মধ্যে পুরে দিলে বেশ ভাল হয় ।'

আর–একবার একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'মানুষের পেটে জন্মেছিলি কেন বল তো দেখি ।'

মাল্যবানের দিকে ফিরে উৎপলা বলল, 'চলো, বাঘ দেখতে যাই ।'

কিন্তু, দুর্গন্ধে বাঘের খাঁচার থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে থাকল সে । বাঘগুলোর দিকে তাকাতেও গেল না । নাড়ি উল্টে বমি আসছিল উৎপলার । বললে, 'চিড়িয়াখানার ঢের হয়েছে । চলো, এখন বেরিয়ে যাই ।

মনু বললে, 'বাঘ আমার মোটেই দেখা হল না । বাঘ দেখতেই তো এসেছিলাম চিড়িয়াখানায় ।'

কিন্তু, তার কথা কেউই গ্রাহ্য করল না ।

মাল্যবান স্ত্রীকে বললে, 'এই তো এলে চিড়িয়াখানায়; এখুনি বেরিয়ে যাবে? চলো, পাখি দেখে আসি ।'

'পাখি আবার একটা দেখে নাকি । ও তো দিন রাত দেখছি ।'

'না, না, সে–রকম পাখি নয়–'

'পাখি আমি সব দেখে ফেলেছি । ও আমার দেখবার পিবিত্তি নেই ।'

'কলকাতায় তো দেখ কাক আর চড়াই; সরাল, তিতির, কাকাতুয়া, ম্যাক্ক, কত রকম হাঁস, বক, ফ্ল্যামিঙ্গো, ধনেশ, শামকল–দেখবে এসো–দেখবে এসো–'

'যে–ধনেশ দেখাচ্ছ তুমি দিন–রাত ।'

'আমি?'

'আরশোলা যে–রকম কাচপোকা হয়, তেমনি শামকল হয়ে যাচ্ছে তো ধনেশটা–' বলে ফির–ফির ফুর–ফুর ফিঃ–ফিঃ ফুঃ–ফুঃ করে হেসে উঠল উৎপলা ।

তিনজনে মিলে সিন্দুঘোটক দেখতে গেল ।

মনু অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, 'সিংহ দেখা হল না আমার,' বার–বার মরিয়া হয়ে বাপ–মাকে সে তার আবেদন জানাতে লাগল, 'সিংহ দেখব। সিংহ কোথায়? ঐ যে সিঙ্গি ডাকছে!'

কিন্তু কেউ তার কথা কানেও তুলতে গেল না।

সিন্ধুঘোটকগুলো রয়েছে একটা পুকুরের মধ্যে–ঢের নীচে। চারদিকে দেয়াল। একজন শাহেব ছুঁড়ে–ছুঁড়ে হেরিং মাছ, না কী, দিচ্ছিল তাদের। উৎপলা চেঁচিয়ে বললে, 'উঃ, কত মাছ খাচ্ছে।'

'তা খাবে না–হাতির মত গতর।'

'গা কেমন–কেমন করে ওঠে যেন।'

'কেন?'

'এ যে বালতি–বালতি মাছ খেয়ে ফেলল।'

'তা খাবে বৈকি।'

'ডিসপেপসিয়া হবে না।'

মাল্যবান ঠোঁট চুমড়ে একটু হেসে বললে, 'হ্যাঃ, ডিসপেপসিয়া!'

মনুর মাথা দেয়ালের নীচে পড়ে থাকে; সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বরবার নাকিসুরে বাবা–মাকে ডেকে–ডেকে বলছিল, 'কই, মাছ কোথায়? কী রকম করে মাছ খায়? কুমিরের মতন নাকি সিন্ধুঘোটক? কই, সিন্ধুঘোটক কোথায়?'

কিন্তু, রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল, সেই বাপ–মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভিতর আনল না।

উৎপলার কপালে গালে এমন সব খাঁজ ফুটে উঠল যে, কুৎসিত দেখাতে লাগল তার সুন্দর মুখটাকে; বোঝা গেল, তার বয়েস হয়েছে; অবসাদে বললে, 'এই তোমার চিড়িয়াখানা!'

'কেন মন্দ কী।'

'নাঃ, এখানে আর–কোনোদিনও আসা হবে না।'

'আমার তো বেশ লাগে।'

'দেখবার ভেতর দেখতে চেয়েছিলাম তো বাঘ আর সিংহ। তাও, বাবা কী ভক–ভক করে গন্ধ আসে–কে এগোতে পারে।'

'বাঘ কেন, দেখতে হয় পাখি।'

'তোমার রুচি তো আমার নয়। শামকল পাখির চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখব আমি? তা হলে তো পাখিই সবচেয়ে ভাল মনে হত–সবচেয়ে ভাল লাগত শামকল পাখি–'

'তা হলে মন্দ হত কি?' প্রতীক পৃথিবীর সে–এক আলাদা নিগুঢ়তার ভেতরে যেন দাঁড়িয়ে বললে মাল্যবান বস্তুপৃথিবীর নারীকে ।

'হল না তো ।'

'আসছে জন্মে হবে ।'

'আসছে জন্মে আবার শামকল! ওরে বাবা!' উৎপলা ধর–ফড় কেঁপে উঠে বললে, 'না রে বাবা, তার চেয়ে কোনো জন্ম না–পাওয়াও ভাল । জন্ম নিলে ময়ূর হয়ে উড়ে যাব আমি সেই গোরক্ষপুরের দিকে জঙ্গলে–'

'সেখানে সরবতি দই বিক্র করছে বুঝি মহলানবিশ মশাই । বেশ, বেশ, যেও, চলে, চন্দনা, তিতির দেখে আসি–'

মনু বললে, 'তিতির কী বাবা?'

'মাল্যবান কোনো উত্তর দিল না, উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চলো, দাঁড়িয়ে যে, চলো । ডাকপাখি, বাজ, শিকরে বাজ, খানদানি শামকল দেখে আসি সব–দেখে আসি সব ।'

কিন্তু একেবারেই কোনো তাড়া ছিল না উৎপলার । মাল্যবানের দিকেও তাকাতে গেল না সে, 'আমার একটু জিরোতে হবে রে বাবা । পাদুটো ধরে গেছে–মাজা ভেঙে গেছে–বাপরে!'

তিনজনে একটা গাছের নীচে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল ।

বসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘাসের ওপর যে বড় বসলে সবাইকে নিয়ে; ঐ তো বেঞ্চি ছিল ।'

'বেঞ্চির চেয়ে ঘাসে বসতে ভাল লাগে আমার ।'

মনু বললে, 'বেঞ্চির চেয়ে ঘাসে ভালা লাগে আমার'

'ঘাসে আমার কুট–কুট করে,' উৎপলা বললে, বেঞ্চিতে গিয়ে একাই বসল সে, বসে বললে, 'কত লোক তো বেঞ্চিতে বসে আছে; বসতে ভাল লাগে বলেই তো,' উৎপলা নিজের মনেই তারপর বললে, 'এত সব লোক চারদিকে; তাদের সঙ্গে বেশ তো খাপ খায় আমার, অথচ ঘরের মানুষদের সঙ্গে ষাঁড়ষাঁড়ির কোটাল । ঘাসে গা ছড়ে যায়, আমার শাড়ি নোংরা হয়, মুচি–মোচলমানের চন্নামৃতে গড়াগড়ি খেতে হয়–অথচ ঘেসুরে সেজে বসেছেন সব ওঁরা–ঘাস!–ঘাস না হলে হবে না । আঁটি–আঁটি ঘাস বাঁধবে না কি তোমরা বাপ–বেটিতে মিলে–'কথা বলে যেতে লাগল উৎপলা–

মাল্যবানের থেকে উৎপলা হাত দশেক দূরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মাল্যবানের মনে হতে লাগল ঃ এইটুকু ব্যবধান ঘোচাতে–সত্যিই যদি ঘোচাতে পারা যায়–উৎপলার তরফ থেকে আহ্বান আসবে না কোন দিন । তাছাড়া, বেঞ্চিতে তো ঘাসের ভেতরে ঘাস নয়, মনু আর আমি

ঘাস–ঘাসের ঢেউয়ে; বেঞ্চিটা ঘাসগাছের কাঠেও তৈরি নয়–ঘানগাছের কাঠেও নয়; সে–রকম কাঠ নেই কোথাও; কেঠো কাঠ আছে, এত ঘাস থাকতে কী ভীষণ কেঠো কাঠের বেঞ্চি চারিদিকে সব ।

উৎপলা বললে, 'চলো, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি; প্রকাশবাবুর আজ সন্ধ্যের সময় আসার কথা ছিল ।'

'পাখি দেখবে না ।'

'আমি সিংহ না দেখে যাব না,' মনু বললে ।

'আচ্ছা, ঐ যে একটা টেবিলের চারদিকে বসে কয়েকটি লঙ্কা মেয়ে চা খাচ্ছে, ওরা কারা?'

'চিনি না তো, দেখিনি কোনদিন!' মেয়েদের দিকে না তাকিয়েই মাল্যবান বললে ।

'কেমন এক বিঘত পেট বার করে শাড়ি পরেছে; কেমন কানের পাশে জুলপি ঝোলাবার কায়দাটুকু । নিশ্চয়ই আইবুড়ো এরা সব । বাস্তবিক, যারা বিয়ে করে নি, তাদেরই রগড়–' বরে উৎপলা মুখ ফিরিয়ে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল যেন মেয়েটিকে ।

মাল্যবানের ভাল লাগল না, 'ওদের দিকে চোখ দিও না, বাপু । ওরা চা আর স্কোন খাচ্ছে । কেন চোখ লাগাচ্ছ পলা ।'

মাল্যবান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ঘাসের শিষের শাদার দিকে তাকিয়ে রইল; কিছুক্ষণ মনুর কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করল; তারপর উৎপলার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, তেমনি করেই মেয়েটির দিকে গোগ্রাসে চেয়ে আছে সে!

'এখানে এসে বসো তুমি–এই নরম ঘাসে ।'

'চলো, এখন উঠি ।'

'কোথায় যাবে?'

'এখানে বসে কী আর লাভ?'

'তোমার পা ব্যথা করছে, বলছিলে–চা খাবে?'

'না । ব্যথা কমে গেছে ।'

'চলো–না ঐ মেয়েদের পাশে আর–একটা টেবিল খালি আছে–'

'না । ব্যথা কমে গেছে ।'

'চলো-না, ঐ মেয়েদের পাশে আর-একটা টেবিল খালি আছে–'

'না, তুমি আমাকে আর–এক দিকে নিয়ে চলো ।'

মেয়েকটির দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে–হাঁটতে উৎপলা বললে, 'ভেবেছিলাম, আজ কপালে সিঁদুর–টিপ পরে আসব না–'

'কেন?'

'সব সময়েই এ–সবের কী দরকার।'

'হ্যাঃ, রেওয়াজ উঠে গেছে,' মাল্যবান বললে, 'ও–সবের টিপ–টাপ ফেঁদে কী হবে।'

'যদি না সিঁদুর ধেবড়ে আসতাম, তাহলে এই মেয়েরা কী মনে করত, বল তো দেখি–'

মাল্যবান এ–কথা সে–কথা ভাবছিল, বললে, 'মনে করত একটা কিছু। মনে করার বালাই নিয়ে মরি আমি।'

'তোমাকে হয়তো মনে করত আমার মেসো কিংবা মামাশ্বশুড়–'

'আমাকে যদি ওরা তোমাদের বাড়ির খাজাঞ্চি কিংবা সরকার মনে করতে পারত, তা হলে হয়তো খানিকটা লাভ ছিল–'

মাল্যবান হাঁটতে–হাঁটতে একটা চোরকাঁটা ছিঁড়ে খড়কে বানিয়ে বললে, 'সেই যে বিলেত গিয়ে মাখন–তোলা শিখে এসেছে–সব সময়ে শাহেবি পোশাকে থাকে, শাহেবি করে বেড়ায় সেই যে মাখন–তোলার শাহেব আমাদের মতীন চৌধুরী গো–তাকে যদি সঙ্গে করে আনতে পারতে, তা হলে তোমাকে ওরা ছো–ছো করে চিলের চোখ দিয়ে দেখে নিত বটে। ওদের ঐ রকমই তো স্বভাব। আমার মতন ধনকৃষ্ণের সঙ্গে চিড়িয়াখানা রোঁদ দিতে এসেছ–এ আবার একটা দেখবার কী। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে কে!'

'মতীন চৌধুরী কে?'

'আহা, বললাম যে বিলেত থেকে মাখন তুলতে শিখে এসেছে।'

'দুধের থেকে মাখন তুলতে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাখন তোলার সাহেব–'

'তার সঙ্গে আমি চিড়িয়াখানায় আসতাম–মানে?'

'এমনি বলছি–কথার কথা–'

'তুমি বড্ড বেকুব।'

'আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম–'

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে চলছিল না তারা, কোনদিকে যাচ্ছিল খেয়াল ছিল না, এমনি শীতের বিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চিড়িয়াখানার চিলতি–চিলতি মাঠ ঘাসের ভেতর–রাস্তায়–বেরাস্তায়।

'তোমার মাইনে তো আড়াইশ হল। রিটায়ার করবার আগে কত হবে?'

'দুশ পঁচাত্তর–তিনশ–'

'এর বেশি না?'

'না।'

উৎপলা ভাবছিল। চিন্তার মাঝপথে থেমে বললে, 'আড়াইশ টাকা মাইনেতে কি গলাবন্ধ কোট ছাড়া আর–কিছু পরা যায় না।?'

'কেন যাবে না? ধুতি–পাঞ্জাবি পরা যায়! আজ–কাল অনেকেই তো তা পরছে।'

'তা নয়, আমি বলছিলাম হ্যাট–টাইয়ের কথা। কেন পর না তুমি? পরলে মানায় না বটে তোমাকে? কেমন যেন খাপছাড়া দেখায়। এ–রকম হল কেন?'

'কেন হল?' মাল্যবান তার হাতের ঘাসের শিষটা দাঁত দিয়ে কাটতে–কাটতে বললে, 'চিনি মিষ্টি আর নুন নোনতা কি না উৎপলা–সেই জন্যে হল।'

খানিকটা দূর নিঃশব্দে এগুলো তারা। মনুর কথায় কেউ কান দেয় না, নালিশ কেউ শোনো না, সেই জন্যে সে অনেক্ষণ থেকেই চুপ মেরে গিয়েছিল।

উৎপলা বললে, 'খোঁচা–খোঁচা দাড়ি–কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে–চেঁচে এলে না কেন?'

'হঠাৎ তোমরা সকলে বললে, চিড়িয়াখানা দেখবে–সময় পেলাম কোথায়?'

'তাই তো! কী দিয়ে চাঁচবে–জিনিস পাবে কোথায়!'

'দাড়ি যারা সত্যিই চাঁচে, প্রথম পক্ষের মাগকে শ্মশানে পোড়াতে–পোড়াতে গালে হাত বুলিয়ে নেয়–'

'তাই নেয় বুঝি।'

'দাড়িটা কামানো হল কি না দেখে নেয়।'

চিড়িয়াখানা থেকে বেরুচ্ছে না–কিছু দেখছে না–বসছে না কোথাও–পায়চারি করার মত আস্তে–আস্তে হাঁটছে–ঘাসের ওপর দিয়েই বেশি। কোথায় চলেছে–কেন চলেছে–খেই–খেয়াল না হারালেও শুধোচ্ছে না কেউ কাউকে। মনু কোনো কথাই বলছে না। তার পা টাটাচ্ছিল, বুক ধড়ফড় করছিল, জিভ শুকিয়ে আছে অনেক্ষণ। কিন্তু তার কোনো কথায়ই কেউ সাড়া দেয় না, সায় দেয় না বলে কাউকেই সে কিছু বলতে পারছিল না। মনু খানিকটা পড়ে গিয়েছিল; তার জন্যে দুজনে খানিকক্ষণ থেমে দাঁড়াল। মনু এল।

মাল্যবান ঠিক উৎপলার মনের মত ঠাঁটে পা ফেলে হাঁটতে পারছিল না। পাদুটো কিছুতেই আড় ভাঙতে চায় না যেন উৎপলা যা চায় মাল্যবানের পায়ে–পদক্ষেপে সে সৌন্দর্য, মাত্রা, দৃঢ়তা কিছুতেই ধরা পড়ে না। হাঁটতে–হাঁটতে তারা বাঘের ঘরের কাছে এসে পড়ল আবার। খাঁচার ওপর থেকে থপাস–থপাস করে ছুঁড়ে কাঁচা মাংস দেওয়া হচ্ছিল জানোয়ারগুলোকে–

'কী রকম করে এরা মাংস খায়, দেখবে এসো।'

উৎপলা মাথা নেড়ে বললে, 'এখন বেরিয়ে যাব ।'

হাঁটতে–হাঁটতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে উৎপলা বললে, 'আমার দাদা, মেজদা, ছোড়দা, এ–রকম নয় । কখনো ন্যাং–ন্যাং করে হাঁটে না তারা ।'

সামনে তাকিয়ে দেখল দুটো মস্ত হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে– আশেপাশে অনেক ডাল–পালা কেটে রাখা হয়েছে, হাতিগুলো ক্রমাগত শুঁড় দিয়ে সেগুলো টেনে–টেনে খাচ্ছে ।

মনু বললে, 'দেখলে বাবা, কী রকম শুঁড় দিয়ে কলা টেনে নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দেয়!'

একটা মুসলমান ছেলে কলা দিচ্ছিল–পাঁচ–ছটা হাতি, কিন্তু কলা মাত্র দশ–বারোটা; কিন্তু হাতিগুলোর হায়া আছে, নিয়ম মেনে চলাটা দেখবার মত; পাশাপাশি কটাতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউ কারো ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে না, যার কপালে যেটুকু প্রদাস পড়ছে, তাই নিয়েই তৃপ্ত; তারপর ডালপালার দিকে মন ।

মাল্যবান বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল; বললে, 'মানুষের চেয়ে জীবনটাকে এরা বেশি বোঝে । জীবনের কষ্ট ও একঘেয়েমি সহ্য করবার ক্ষমতাও এদের চীনের বা ভারতের জ্ঞানভিক্ষুদের মত । বাস্তবিক, হাজার–দুহাজার বছর আগে এরা ভারতে–চীনে সমাজের বড়–বড় জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেছে, শুনেছে, রক্ষা করেছে–ধর্ম–কর্মের বিধান দিয়েছে বলে মনে হয় ।'

শুনে উৎপলা কোনো সান্ত্বনা পেল না । হাতির কুলোর মত কান ও বুড়ো দিদিমার মত মুখ দেখে কেমন যেন কৌতুক, অসাধ, নিরেস অস্বস্তি বোধ করছিল সে । বললে, 'থাক, অনেক হয়েছে; এখন চলো ।'

হাঁটতে-হাঁটতে মাল্যবান বললে, 'একবার বেরিয়ে গেলে ঢুকতে পারবে না কিন্তু আর ।'

'আমি ঢুকতে চাইও না আর । এ–জায়গায় কোনোদিনও আর আসা হবে বলে মনে হয় না ।'

'চলো, ছোলা কিনে নিয়ে কাকাতুয়ার ঘরে যাই; দানা খাবে আর পড়বে কা–কা–তু–য়া ।'

'এক–আধটা পাখি বেশ পড়ে । সবগুলোই পারে?

'পড়ালেই পারে । চলো ।'

'থাক ।'

'নানা রঙের কাকাতুয়া আছে, বেশ পশমের মত পালক; ডানার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন আগুনের থেকেই উৎপত্তি হয়েছে ওদের সব–আগুনের ভেতর খেলা করছে সব–আগুনে–আগুনে খেলা করে একদিন । আকাশে নীলিমায় মিলিয়ে যাবে–চলো–চলো'–

উৎপলা দাঁড়িয়ে রইল; আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ঐ তো টেবিলটা, সেই মেয়ে চারটি ওখানেই বসেছিল? ওখানে?'

মাল্যবান কিছু বলবার আগে উৎপলা বললে, ‘কোথায় গেল তারা?’

‘চলে গেছে।’

‘চিড়িয়াখানার ভেতর কোথাও তো তাদের দেখলাম না।’

‘বেরিয়ে গেছে।’

‘এত তাড়াতাড়ি বেরুল যে?’

‘ঢুকেছিল আমাদের ঢের আগে। দেখা–শোনা মজামারা হয়ে গেল–বসে থাকবে কেন। বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন কি সারাদিন বসে খাবে?’

মাল্যবানের অন্নপ্রাশনের কথাটা কোনো কথা নয়; একবার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চোয়াল শক্ত করে কথাটা তারপর ঝেড়ে ফেলে দিল উপৎপলা; বললে, ‘দেখলাম, মেয়েকটির প্যাঁচে–প্যাঁচে বেশ জিলিপির রস। হাত তুলে ফুর্তি করছে। আগা–পাশতলা মিঠিয়ে–ঝিকিয়ে কী ফুর্তির তোড়–সারাটা সময়; টেঁসে যাচ্ছে না তো–আমার ও–রকম হয় না তো।’

‘বেঁচে যেতে বুঝি ওদের মত ফুত্তি করতে পারলে?’

‘হলে কেমন হত?’ একটা বীতকাম নিশ্বাস ছেড়ে উৎপলা বললে।

‘ফুত্তি মানে আমোদ–’

‘আমোদ বলছ তুমি?’

‘সত্যিকারের আমোদ–’

‘মানে, আনন্দ?’

মাল্যবান ঘাসের ওপর পিচ কেটে বললে, ‘ওঃ, ঐ সব মেয়ে! ওরা তো ছেনাল–আনন্দ–আমোদের ইস্টকুটুম আমার সব। ওদের কথা ভাবে মানুষে! ওদের ঘাঁটিয়ে আবার কথা বলে!’ মাল্যবান দাঁত–মুখ খিঁচিয়ে পিচ কাটল ঘাসের ওপর আবার।

‘তবে কী; ছাগল দিয়ে ধান মাড়িয়ে দশ মুখ করে সেই ছাগলের কথা বলে বুঝি?’

চলতে–চলতে মাল্যবান থেমে গেল, ‘কোথায় যেতে চাচ্ছ তুমি?’

‘এবার চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে যাব’, উৎপলা বললে।

‘আমি তা বলছি না। তুমি রাখালি করে ধান খেতে চাচ্ছ তো ছাগলকে সরিয়ে দিয়ে। ঐ মেয়েগুলোর মত পাটে এসে বসতে চাচ্ছ তো–’

'কে না চায় পেতে বসবার পাট। কিন্তু দেবার ভার তো শামকলের ওপর নয়। মনু, এদিকে আয়। কেউ কারু ওপর বরাত দিতে পারে না। ধনেশ পাখি ঠোঁট কেলিয়ে বসে থাকবে–মাড়োয়ারি কবে তার তেল নিতে আসবে, সেইজন্যে–চন্দনা নিজের পাটে উড়ে যাবে। মনু!'

মাল্যবান চিড়িয়াখানা থেকে বেড়িয়ে যাবার গেট এড়িয়ে অন্য পথ ধরে চলতে লাগল। উৎপলা বুঝতে পারল না। অনেকক্ষণ হেঁটে বললে, 'কই, এ–গোলক ধাঁধা ফুরোয় না দেখছি–'

'বেরুতে চাও?'

'মনু কোথায় গেল–'

'চলো ঘুরি।'

'ঘোরো তুমি।'

'তুমি কী করবে?'

'একা তো বেরিয়ে যেতে পারব না', কাছে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে চোখ বুজে বসল উৎপলা!

'পা টাটাচ্ছে?'

একটা খালি বেঞ্চি–আলগোছে তার এক কিনারে বসে পড়েছে উৎপলা–একটা হাত তার বুকে–আর–একটা কোলের ওপর ভাটার টানে সমুদ্র সরে গেলে ভিজে ঝিনুক, পরগাছার ঠাণ্ডার মত করুণ হয়ে পড়ে আছে। খানিকক্ষণ এদিক–সেদিক উঁচু–উঁচু গাছের মাথায় আকাশের মেঘ আলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন কেমন একটা অন্তিমপ্রতিম অর্থ অবধান করে তারই কাছে শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে নির্বিশেষে ছেড়ে দিল উৎপলা; একটু কাত হয়ে ডান হাতের ওপর মাথা পাতল; চোখ বুজে এল।

মনুও ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন উৎপলা আগ বাড়িয়ে বললে, 'সিনেমায় চলো।'

অপিস ছুটি ছিল সে–দিনও, তিনটের শো–তে গেল তারা। ট্রাম থেকে নেমে উৎপলা বললে, 'বক্সে বসবে তো?'

'না, সে ঢের খরচ।'

'তা হলে কোথায় যাবে আবার। ছবিতে বক্সে না বসলে ভাল লাগে না।'

'কেন, নীচের গদিতে বসেও তো বেশ আরাম।'

'আরামের জন্যে বলছি না আমি–'

'তবে?'

'বক্সে বসলে নীচের লোকেরা হাঁস–হাঁসিনের মত ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকায়, দেখতে বেশ লাগে।'

মাল্যবান হেসে বললে, 'ওঃ, সেই কথা; দু–তিন ঘণ্টার জন্যে তো শুধু, তার পর সিনেমা ভেঙে গেলে কেউ কি আর বক্সের মানুষের কথা মনে রাখে।'

'তা রাখে বইকি। যদি কোনো চেনা মানুষ নীচের থেকে আমাদের দেখতে পায়, তা হলে জনে জনে বলে বেড়াবে কথাটা। আচ্ছা রগড়ই হবে! খুব কি খারাপ জিনিস হবে কথাটা চার হাত–পায়ে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াবে–'

কেমন যেন নির্দোষ শয়তান মেয়ের মত হাসি–ডোঁপো ইশকুলের–উৎপলার পাউডার–ক্রিম মাখানো চমৎকার মুখখানাকে আঁকড়ে ধরল। হি–হি করে হাসতে লাগল। সে।

মাল্যবান আড় চোখে একবার উৎপলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, তা নয়–তবে এতে আমাদের কী আর লাভ।'

'বেশ রগড় হয়।'

'ও–রকম রগড়ের কী আর মূল্য আছে।'

'মূল্য নেই? তুমি বললেই হল নেই? নিশ্চয়ই আছে। না থেকে পারে না।'

হাঁটতে–হাঁটতে উৎপলা বললে, 'সে দিন তো সোনার ঘড়ি বেচেছ, তিনশ পঁচাত্তর টাকা পেলে–বক্সের টিকিট কিনতে তোমার এত ভয়–'

'মিছেমিছি পয়সাবাজি করে কী লাভ।'

'মিছেমিছি হল?'

'চেনা মানুষ কে এমন থাকবে নীচে যে বাক্সে আমাদের দেখে ঈর্ষায় রাতে ঘুমোতে পারবে না আর,' বলেই মাল্যবান একটু দাঁত বার করে হাসল।

উৎপলা বললে, 'ঝপ করে মিথ্যে কথা বলে ফেললে।'

'কেন, মিছে কথা কী হল?'

'ঈর্ষার কথা বলেছিলাম আমি?'

'বেশ মজা হবে, বেশ পাঁয়তারা কষা হবে, বলেছিলে তুমি। তা তো হবে, কিন্তু অন্যেরা ঈর্ষায় না পুড়লে রগড় ফলাও হয় কী করে?'

'বেশ তো পুড়ুক হিংসায়!'

'বেশ। পুড়ুক।' মাল্যবান টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মাল্যবান অবিশ্যি সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কাটল–ম্যাটিনির সময়ে আদ্ধেক দামে পেলে–তিন-চার টাকাও খরচ হল না তার ।

‘যাক, আমি বাড়ি ফিরে যাই–’ উৎপলা প্লাগ ঢোকাতে গিয়ে বিদ্যুতের ঘ খেয়ে যেন বললে ।

‘কেন?’

‘দেখবে না সিনেমা ।’

‘তুমিই তো সকাল থেকে তাড়া দিলে সিনেমায় আসবার জন্যে ।’

‘ঢের হয়েছে, আর কোনোদিন আসতে চাইব না ।’

‘কিন্তু এখন তো চলো ।’

‘তুমি আর মনু যাও ।’

‘আর তুমি?’

‘ঠিক আছে । যাও তোমরা ।’

‘হুশ, এ–রকম ছেলেমানুষি করে না কি, পলা ।’

‘কী টিকিট কিনেছ, দেখেছি আমি,’ ঝামটা মেরে উৎপলা বললে, ‘ছেলেমানুষি? আমার? নাম ডোবালে তুমি । ধনমান খোয়ালে টিকিট কিনে । ওমা, থার্ড ক্লাসের টিকিট!’

‘কে বললে তোমাকে?’ টিকিটগুলো উৎপলার চোখের সামনে ধরে মাল্যবান, বললে, ‘সেকেন্ড ক্লাস–’

‘তবে দেড় টাকা নিলে কেন–সেকেন্ড ক্লাসে তো তিন টাকা দু–আনা নেবার কথা–’

‘ম্যাটিনিতে অনেক দিন পরে এলাম, তাই ভুলে গেছ দর–দস্তর সব । এটা ম্যাটিনি–আদ্ধেক দাম–’

উৎপলা দু–এক পা হেঁটে মুখিয়ে এসে বললে, ‘তা হলে ফার্স্ট ক্লাস করলেই পারতে ।’

‘ভেবেছিলাম, কিন্তু তাতে সিট বড় পেছনে পড়ে যেত ।’

‘আ মল! সিনেমায় পেছনে বসেই তো ভাল দেখা যায়–’

‘কিন্তু, তুমি চোখে তো কম দেখ–’

‘কে, আমি?’ উৎপলা মাল্যবানের দিকে সাঁ করে তার গালে চড় মারবার মত চোখ তুলে তাকাল, আমি চোখে কম না দেখলে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেনার ওজর টেকে না? না কি?’

‘তাই বুঝি তাই? গতবার যখন তোমাকে ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেলাম, তুমি সমস্তটা সময় আমাকে বললে, কিছু দেখছ না, ঝাপসা দেখছ– তুমি তো সামনে এগিয়ে বসতে চাইছিলে সে দিন’–বলতে বলতে মাল্যবান উৎপলার দিকে সোজাসুজি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললে, ‘দাঁড়িয়ে রইলে যে–’

‘আমি বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে একটা বাস ধরে চলে যাব ।’

'ছবি দেখবে না?'

'উৎপলা মুখ ফিরিয়ে রইল।

মাল্যবান বললে, 'বেশ বাড়ি চলো তা হলে–'

'এ–টিকিটগুলো পাল্টে টাকা নিয়ে এসো।'

'এখন ফেরত নেবে কেন?'

'তা হলে বিক্রি করে দাও কারু কাছে।'

'কে কিনবে?'

'গলাবন্ধ ছিট, খোঁচা দাড়ি দেখলে কেউ কিনবে না বটে।'

আজ অবিশ্যি মাল্যবান একটা তসরের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছিল–, দাড়িও কামিয়ে ছিল।

একটু কাঠ মেরে গিয়ে, হেসে, হাসিমাখা দাঁতে কুণ্ঠায় সঙ্কোচে মাল্যবান ইতস্তত তাকাতে লাগল। কার কাছে টিকিট বিক্রি করা যায়। দু–চার জায়গা ঘুরে সুবিধে হল না। তারপর একজন ভদ্রলোক টিকিট নেড়ে–চেড়ে বললেন, 'আজকের তারিখ তো? কলকাতা শহরে নানা রকম চোট্টা থাকে; যাক, তারিখটা আজকেরই; হ্যাঁ, এই সেন্টারের সিটই আমি চেয়েছিলাম–আমি আর আমার দুই মেয়ে। তা বেশ, টিকিটের মাথায় দু–আনা দু–আনা কম নেবেন, একুনে ছগণ্ডা পয়সা কমিয়ে দিতে হবে। আপনার তো সবই ভাগাড়ে গড়াচ্ছিল–'

পকেট থেকে ব্যাগ বার করে ভদ্রলোক বললেন, 'আট আনার টিকিট ফুরিয়ে গেছে কিনা সাব। এসেছিও সেই চেতলার থেকে কলকাতায় ছবি দেখতে। ফিরে যেতে তো আর পারি না; নইলে আমি ও হাতির শুঁড় ব্যাঙের লেজ সব অফিস থেকেই কিনি। তা এই একটা টাকা নিন, টিকিট তিনটে দিয়ে দিন আর–কি।'

উৎপলা মাল্যবানের পাঞ্জাবির ঝুল ধরে এক টান মেরে বললে, 'কই, ভেতরে তো ঘণ্টা পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে–দাঁড়িযে পা ব্যথা হয়ে গেল, তবুও তোমার ন্যাকড়া ফুরোয় না দেখি।'

শুনে মাল্যবানেরা পা চালাতেই ভদ্রলোকটি বললেন, 'ও মশাই, ও মশাই, শুনছেন, দেড় টাকাই দিচ্ছি, নিন, আসুন, নিন। ও মশাই, ও দাদা!'

আর ও দাদা! তিন জনে ভেতরে ঢুকল। মনু মাঝখানে, দু পাশে দু জন; গদি–আঁটা চেয়ারে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ লাগছিল মনুর–মাল্যবানেরও। 'বই' আরম্ভ হয়ে গেছে।

উৎপলা পর্দাটাকে অগ্রাহ্য করে ওপরের দিকে তাকাতে লাগল বেশি। বক্সে কে কোথায় বসেছে ঠাহর করতে পারা যায় কি না, কোনো চেনা মুখ চোখে পড়ে কি না; ফার্স্ট ক্লাসের সিটেই–বা কারা; এই সব

নিয়ে অনেক কটা মুহূর্ত কেটে গেল তার। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কিছু বুঝল না সে। তারপর নিশ্বাস ফেলে অবসন্ন হয়ে ছবির দিকে তাকাল। একজন অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান পুরুষ উৎপলার পাশের সিটে বসে সিগারেট টানছিল; মন তার বিচ্ছিরি লাগছিল তাতে।

মাল্যবানকে বললে, 'তুমি এখানে এসো, আমি তোমার চেয়ারে গিয়ে বসি।'

সিট বদলে যখন বসেছে, 'উৎপলা দেখল তার পাশে একটি অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান মেয়ে চকোলেট খাচ্ছে আর কাশছে–

অনবরত কাশছে–

ব্যতিব্যস্ত বোধ করল উৎপলা, পরপর চার–পাঁচটি ফিরিঙ্গ মেয়ে বসে গেছে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'এ পাঁচ জন কি বি–এন–আর-এর মেয়ে না কি টেলিফোনের–'

'আস্তে।'

মেয়ে কটি নিজেদের বাড়ির খরব, হাঁড়ির খবর, মাঝে–মাঝে ছবির তাৎপর্য নিয়ে গলা ছেড়ে হাঁকড়াবার জন্যেই হাজির হয়েছিল। যখনই ঘরোয়া কথা বলবার তাগিদ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, হেসে, হল্লা করে চিৎকার পেড়ে, পর্দার ছবিটাকে তারাই তো জিইয়ে রাখছিল–

'কিন্তু জানে না, বোঝে না, কলির সন্ধ্যায় কী করবে আর, চেঁচাচ্ছে–' একটু নড়ে–চড়ে বসে কৌতুকে ও বিমর্ষতায় বিমিশ্র একটা নিশ্বাস ফেলে উৎপলা বললে।

'কাদের কথা বলছ।'

'ফিরিঙ্গে মেমদের, গুল ছাড়ছে শুনছ না?'

'কেন ঘাঁটাচ্ছ ওদের?' মাল্যবান উৎপলার কাঁধের ওপর এক বার হাত রেখে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে।

কিন্তু, তবুও কথা বলবার দরকার আছে ঢের উৎপলার। চাপা গলায় বললে, 'ছবি তো আমরাও দেখছি, বাপু, তোমরাও দেখছ। ছবি তো চিত্তির; তা তো দেখছিই! কিন্তু তাই বলে দিক–বিদিকে নয়াল আন্ডা ছুঁড়ে একবারে ঝোল বের করে দেবে না কি? পর্দায় এক জনে একটা ছেঁড়া ট্রাউজার পরে এসেছে–অমনি হি–হি করে হাসি; একটা গাধা দৌড়ে গেল–অমনি হু–হু হু–হু; পকেটের থেকে এক জনে এক জোড়া নকল গোঁফ বের করল–অমনি ফ্যা–ফ্যা; বাস্কেটের থেকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল তো আমাদের মাথায়ও চাতাল ফাটল। হাতিবাগানে আগুন লেগেছে, না কি দমকল ছুটেছে, না কি শোভাবাজারের দামোদর বাবুরা সব খুন হয়ে গেল–এ কী সব মাগীদের কোলে করে বসেছি আমি!'

মাল্যবান ঘাড় কাত করে একটা সিগারেট জ্বেলে নিল। উৎপলা বা অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান মেয়েদের দিকে সে ফিরে তাকাল না। ছবিটা তাকে আকৃষ্ট করেনি। মাল্যবান ছবি দেখতে–দেখতে নিজের সত্তার ভেতরের

অঙ্গারশিল্প ও কাঠখোদাইয়ের আবছায়া মত অনুপম ছবিগুলো দেখে নিচ্ছিল—চোখ বুজে। বাস্তবিকই চোখ বুজে ছিল সে। ...... ঘুমোচ্ছিল না, কথা ভাবছিল; কারা যেন কোথায়—অনেক দূরে সঙ্গত করছে। এক মনে শুনছিল সে।

মাল্যবানকে একটা ধাক্কা দিয়ে উৎপলা বললে, 'রেলি ব্রাদার্সের, না, পোর্ট কমিশনের? বিয়ে করেছে, না, রাঁড়ি?'

মাল্যবান যেন অপারেশন টেবিলের ক্লোরোফর্মের ঘোর আস্তে—আস্তে কাটিয়ে উঠতে—উঠতে চোখ মেলতে—মেলতে বললে, 'কে?'

'এই তো মেমশাহেব কটি, আমার পাশে যারা বসে আছে?'

'ওরা?' মাল্যবান অনেক খানি জেগে উঠে আরো জেগে উঠতে চেয়ে, তারপরে বললে, 'ওদের দিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমাকে ছবিটা দেখতেই দিচ্ছে না।'

'ওদের মনে ওরা থাক। ছবি দেখতে দিচ্ছে না বলছ। দেখ ছবি; দেখলেই তো দেখা হল!'

'বলে দিলি কথা! আর বাপু, কী রকম গুল মারছে শুনছ না। হাড়হদ্দ ঘাঁটিয়ে বার করছে।'

'কিসের?'

'না কিসের?'

'ওদের কথায় কান দিও না।'

'কান টেনে মাথা টেনে নিয়ে যায়—যে—'বাপ, রে' উৎপলা ধড়—ফড় করে উঠল, 'আমাকে চেপে বসেছে। ধরছে—উঃ!'

'দেখ না, ছবিটা দেখো—'

'এই জন্যেই আমি বলেছিলাম বক্সের কথা। উঃ! ধরো ধরো—হাতিমুখো গণেশ এসে আমার কোল ঠেসে বসেঠে রে বাবা—গেল—গেল—হয়ে গেল—হয়ে গেল আমার—'

'ছবিটা দেখো, ছবিটা দেখো—'

মাল্যবানের সিটে এসে বসল উৎপলা।

মাল্যবানকে যেতে হল তার স্ত্রীর চেয়ারে। সেই অ্যাংলো—ইন্ডিয়ান পুরুষটি রইল উৎপলার পাশে। কিন্তু লোকটা চুপচাপ, উৎপলার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

খানিকক্ষণ স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, 'খুব হিজিবিজি বই, না?'

'ছবিটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'খারাপও লাগছে না তোমার। আড়ি পেতে তাকিয়ে আছ তো বাপু।'

'কী করব, আট গণ্ডা পয়সা দিয়েছি–'

মনু ঘুমোচ্ছিল।

উৎপলা তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেলে বল, 'দেখ, ছবি দেখ– তোর জন্যেই তো গচ্চা গেল দেড় টাকা। খা–খা–গঙ্গার ইলিশ খা–না খাবি তো সুঁটকি মাছ খা। চারদিকে সব বকনা বাছুর হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাদের কানে ডাঁশ উড়ছে। কী খাবি খা–কী খাবি খা–' বলে গাঁট্টা মারতে–মারতে মনুকে জাগিয়ে দিল উৎপলা।

মুন চোখ কচলাতে–কচলাতে এ–দিক সে–দিক তাকিয়ে অবশেষে ছবির দিকে ফিরে চুম্বক পাহাড়ের দিকেই ফিরল যেন–এমনই লেপটে রইল ছবির গায়ে যে, কিছুই দেখল না আর। দেখেশুনে তবুও গাঁট্টা মারতে গেল না আর মনুর মাথায় উৎপলা। সময়ের ভিতরে নয়–নিঃসময়ে নয়, নিজের প্রাণে অথবা অপরের হৃদয়েও নয়–অথচ এই সবেরই পরিচিত–আধোপরিচিত কেমন একটা আপতিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ঘাড় হেঁট করে ডুবে যেতে লাগল উৎপলা অনুপম অপর দেশের জীবন, অন্ধকার, মৃত্যু, নির্দায়ের ভেতর।

চার-পাঁচ দিন পরে উৎপলা পিওনের হাত থেকে কার্ড নিয়ে পড়তে–পড়তে উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'বড়বৌঠানের সংবাদ লিখেছে।'

মাল্যবান সর্ষের তেল গায়ে মাখছিল, 'এই বয়েসে আবার সংবাদ–' বলে নিরেস চোখে–মুখে তেল মাখতে লাগল আবার।

'তা হবে তো। কেন হবে না?'

'বড়বৌঠানের বয়েস না কত?'

'চুয়ান্ন।'

'এ–রকম বুড়ো গিন্নীদের যে ছেলেপুলে হয়, তা আমি জানতাম না।'

উৎপলা কার্ডটা ব্লাউজের ভেতরে গলিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও ভেঙে বল তো দিকি–'

'তা নয়, আমি বলছিলাম–' মাল্যবান চুপচাপ তেল মাখতে লাগল।

'না বললেও বুঝেছি আমি, পেটে–পেটে তুমি কী বলতে চাও–'

'না, না আমি ভাবছিলাম–' মাল্যবান থেমে গিয়ে হঠাৎ এক ফাঁকে ঝপ করে বলে ফেলল, 'আবার এই বয়েসে ছেলেপুলে–'

'সে কি বাবা, ছেলেটা না আসতেই মারমুখো হয়ে পথ আটকে দাঁড়াবে না কি?'

'আমি দাঁড়ালেই–বা শোনে কে–' দাঁতে কেটে–কেটে হাসতে–হাসতে মাল্যবান বললে।

উৎপলা গুনগুন করে গাইতে–গাইতে ছাদের দিকে গেল–বড়বৌঠানের সন্তান হবে বলে ছায়ানট–ছায়ানটের পরে ভীমপলাশি–তারপরে বাগেশ্রী–কিন্তু প্রত্যেকটা গানেরই এক–আধ লাইন মাত্র। পিঠে তেল মাখতে–মাখতে মাল্যবান ভাবছিল; নিজের বেলা তো উৎপলা এই বার বছর পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়ে গেল, একটি সন্তান যা হল, তাও মেয়ে; এই প্রথম, এই–ই শেষ; বংশে ছেলে না হলে নাই–বা হল–এই তো ভাবে উৎপলা। কিন্তু পরের বেলা সে তেরটির পর চৌদ্দটিকে দেখ কেমন বেহাগ ভৈরবী কীর্তনের সুরে ফলাও করে ফলাচ্ছে ছাদে–ছাদে। এটা কী কাজ করছে উৎপলা, ঠিক কাজ করছে? ঠিক নয় অবিশ্যি। মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু, তবুও, এইটেই ঠিক।

পায়ে তেল মাখতে–মাখতে মাল্যবানের মনে হল; কী জানি, আমার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে এত দিনে উৎপলাও আট–দশটি সন্তানে মা না হয়ে ছাড়ত না হয় ত।

মাথায় তেল মাখতে–মাখতে কড়া রোদের আকাশটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মাল্যবান; আমার প্রতি সে যতখানি বিমুখ, অন্য কোনো পুরুষ–মানুষের জন্যে ঠিক ততখানি আগ্রহ তার থাকতে তো পারত; তা হলে কী হত? বেশ ঝরঝরে নদীর পাশে তরতাজা সবুজে–সবুজে ফন ফন করে উছলে উঠত পানের বন তা হলে, উৎপলার পানের বন, নীল কালো সাপশিষের মত রোদে বাতাসে–হাওয়া বৃষ্টি নিঝোর ফলসানির ভেতর।

উৎপলা কীর্তন গাইতে–গাইতে ছাদের থেকে ফিরে এল–

'তোমার দাদার বয়েস কত হল এবারে?'

'চৌষট্টি।'

'চৌষট্টি!'

'তা তিনি কি আজকে জন্মেছেন–'

'খুব বুড়ো হয়ে গেছেন তো তা হলে–'

'আজকের মানুষ তো নয়–'

'তাই তো, খুব বুড়ো তো–'

'বুড়ো–বুড়ো করে মুখে গ্যাঁজলা উঠল যে বুড়ো খোকার আমার! ঢং,' উৎপলা বললে, 'নাও, এখন বড় বৌঠানের জন্যে কী জিনিস পাঠাবে বলো।'

মাল্যবান গায়ে তেল, পায়ে তেল, মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটা বিচিত্র সরীসৃপের মত চিকচিক করছিল। ছাদের রোদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধাঁধিয়ে উঠছিল উৎপলার চোখ; সরীসৃপকে সে একবার দেখছিল ঝিকমিক আঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নুয়ে পড়ছে, হাত নাড়ছে, চোখ পাঁজলাচ্ছে, আর–একবার মিলিয়ে যাচ্ছিল সব–অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত অন্ধকারের ভেতর কাউকেই, কিছুতেই আর দেখছিল না উৎপলা।

মাল্যবানকে যথেষ্ট হিংস্র, অথচ আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই না, বরং বেশ চকচকে মনে হচ্ছিল হয়ত উৎপলার; ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার মানে হয় তো এই নয় যে, উৎপলা বেশ কাতর হয়ে পড়ছিল; এবং মাল্যবান বেশ প্রখর হয়ে উঠছিল। হলে হয়ত ভাল হত না।

'আমার মনে হয়, যদি কিছু দিতে চাও, তা হলে তাঁরা লজ্জা পাবেন।'

'কেন?'

'এ–রকম ব্যাপার যে হচ্ছে, এতে এখুনি লজ্জা পাচ্ছেন–'

'তুমি যখন তোমার মায়ের পেটে ছিলে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি! না কি? ম্যাদা মাদার, ঠেলে বেরুল তো তবুও, লজ্জাবতীর ঝাড় থেকে। বেরুল তো। কী হল তাতে? ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীর জনমনিষ্যি সব! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা!'

মনের বিষ ঝেড়ে কথা বলে ছাদে এক চক্কর ঘুরে এসে উৎপলা বললে, 'তেমন হোক না–হোক, একটা বেনারসি শাড়ি অন্তত কিনে দিতে হবে পঞ্চাশ–ষাট টাকার মধ্যে আর রুপোর সিঁদুর কৌটো একটা। আমার ইচ্ছে ছিল সোনার কৌটো দিই একটা। চল্লিশ বছর স্বামীর সঙ্গে ঘর করল তো পয়মন্ত এয়াতি–এই চুয়ান্নতেও তো ফল দিচ্ছে–'

'তোতাপুরি আমের গাছটা?' মাল্যবান খ্যাঁক করে একটু হেসে, বেশি হাসির চাড় সামলে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়বৌঠানকে চিনি আমি–'

'কেমন, বেনারসিতে তাঁকে মানাবে না?'

তা আমি বলছি না,' মাল্যবান তেলের বাটিটার কাছে ফিরে এসে বাটিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, 'এ–রকম একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ যে ঘটা করে, সে–ইচ্ছে তাঁর একটুও আছে বলে মনে হয় না।'

দূরের রৌদ্রে সরীসৃপটা চিকচিক করে জ্বলে উঠেছে। উৎপলা পুডিঙের কামড়ে কঠিন কংক্রিটের মত হয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার। মিলিয়ে গেল ছবিটা; রোদে বিহ্বলতায় চোখ ছটফট করে উঠেছে উৎপলার; অন্তশ্চক্ষু উপড়ে পড়ছে যেন অন্যরকম আগুনে–রৌদ্রে।

'আসল কথা হচ্ছে, কিছু খসাতে চাও না তুমি; আপন লোককে পর মনে করো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার ভাঁড়ামো, চিনি নে আমি তোমাকে!'

তেলের বাটিটা উৎপলা ছাদের ওপর ছুঁড়ে ভাঙল!

'তেল পড়েছে, টাকা আসবে,' মাল্যবান হেসে বললে, 'যাই, চান করি গে।'

অফিস থেকে ফিরে এসে সে বললে, 'চলো, বেরই।'

'কোথায়?'

'কী কিনতে–কাটতে হবে, চলো দেখি গিয়ে–'

উৎপলার মনের থেকে কিছু ধোঁয়া কেটে গেল, 'তা তো বলেছিই, বেনারসি–'

'কিন্তু আমি ও–সব জিনিস একা কিনতে ভরসা পাই না। এসো আমার সঙ্গে–'

'ষাট–সত্তরের কম হবে না শাড়ি; যে তিনশ পঁচাত্তর টাকা মেজদার বাবদ আমার কাছে আছে, তার থেকে কিছু তো খরচ করতে পারি নে–'

'তার দরকার নেই–' মাল্যকান রুমালে মুখ মুছে বললে।

'তবে কোথায় পাবে টাকা?'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলে এনেছি।'

'কত?'

'পচাত্তর।'

নাক–মুখের চেকনাইয়ে চনমন করে হেসে উঠে উৎপলা বললে, 'বা, বেশ গুড বয় তো তুমি। সত্যিই এমন না হলে–। আ গেল, তুমি তো চাও খেলে না।'

চায়ের প্রতীক্ষায় মাল্যবান চেয়ারে বসল গিয়ে। খানিকক্ষণ পরে উৎপলা ফিরে এল, পরটা ও চা নিয়ে নয়, মার্কেটে যাবার জন্যে পোশাক–আশাকে তৈরি হয়ে।

মাল্যবান একটু হতচকিত হয়ে বললে, 'চা খেয়ে গেলে হত না?'

'ঠাকুরটা আজ বড় দেরি করে এসেছে,' উৎপলা মাল্যবানের ছাড়া–চেয়ারে ডান পাটা চড়িয়ে দিয়ে জুতোর পালিশে যে কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল, রুমাল দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলতে–ফেলতে বললে, 'আমিই ভাত চড়িয়ে দিতে বললাম তাই। সকালবেলার সেই পরটাগুলো ঠাণ্ডা মেরে গেছে–লোনার মাকে দিয়ে দিলাম; ওর ছেলের কুষ্ঠ হয়েছিল, কিছু খেতে পায় না।'

উৎপলার সেলাইয়ের কলটা অনেক দিন ধরে পড়েছিল– অবিশ্যি অযত্নে নয়, জিনিসের যত্ন করে সে–কিন্তু অব্যবহারে। কলটার ঢাকনি সাফ করা, ঢাকনি খুলে ঝেড়েপুছে ঝবঝক করে রাখা–হাতে কাজ না থাকলে এটা তার খুবই সোহাগের কাজ।

একদিন সকালবেলা পাশের ভাড়াটেদের একটি ছোট্টা মেয়ে এসে বললে, ‘পলা, মাসিমা, আপনার সেলায়ের কল আছে?’

‘আমি যে তোমার মাসিমা, তা তোমাকে কে বললে?’

মেয়েটি উৎপলার দিকে টলমল করে তাকিয়ে রইল–কোনো কথা বলল না।

মাল্যবান বললে, ‘আঃ, ওকে আর ও–রকম শুধচ্ছ কেন?’

‘কোনোদিন এদের গ্যাঁজও দেখা যায় না’, উৎপলা বললে, ‘আজ কল নেবার সময় পলা মাসিমা! আচ্ছা!’

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে ফ্রকের কাপড় তুলে চিবতে লাগল।

‘তুমি কার মেয়ে গা?’

মেয়েটি তার বাবার নাম বললে।

‘ও সেজগিন্নির মেয়ে তুমি বুঝি?’

মেয়েটি চিবনো কাপড়ের এক কিনার থেকে দাঁত বরে করে বললে, ‘হ্যাঁ।’ উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘সব জল ভরে গড়ায় কি না। ওপরওয়ালার কল এমনিই নড়ে। এই সেজগিন্নিই তো একদিন বলেছিলেন, কলকাতার জল সোনার দরে বিকোয় না কি। খুব মনে আছে আমার।

সেকথা আমি ভুলব কোনোদিন!’

‘কী লাভ ও–সব কথা মনে রেখে!’

‘না, না, তুমি কেন মনে রাখতে যাবে। তোমার দরদে তো মলম ঘষা হচ্ছিল সেজবৌয়ের সে–দিন, আমাকে তাঁবায় চড়িয়ে–’

‘তাঁবায় চড়ালেই কি ফোস্কা পড়ে?’

‘তা আমাদের পড়ে। এই রকম কথা শুনলে গায়ে জলবিছুটি জ্বালা হয়। ইশ!’

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, ‘তোমরা কে হে বাপু, পাশের ভাড়াটে ঘরে থাকো; তোমাদের আমরা খাই না পরি, তোমাদের তেউড়ি–খেসারির খেত মাড়াই, না, বকের বিষ্ঠা দিয়ে বড়ি–খেসারি মেখে দিয়ে ভোগা দিই–তোমার মা যে–’

মাল্যবান উৎপলাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির পিঠে–ঘাড়ে গোটা দুই চাপড় মেরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুমিও পার বাপু! ও কী জানে, ওকে নিয়ে ঘাঁটানোথ– কী হবে ।’

‘কিন্তু কল আমি দেব না ।’

‘সে হল আলাদা কথা ।’

‘আর ঐ সেজগিন্নি বড্ড অপয়া । পর–পর চারটি মেয়ে বিয়ল । পর–পর চারটি মেয়ে বিয়ল–’

ছোট মেয়েটি ফ্রক কামড়াচ্ছিল; আরো জড়সড় হয়ে কামড়াতে লাগল ।

‘সে–দিন তোমার একটি বোন হয়েছে, না খুকি?’

‘হ্যাঁ’

‘তা আমি জানি । সাধে আমাদের বললে না । অথচ দশ মাইল দূর থেকে লোক ডেকে খাইয়েছে । মানুষ যে কী রকম বোকা শয়তান হতে পারে–’

উৎপলা কথা শেষ করতে না করতেই মাল্যবান বললে, ‘খুকি তো দাঁড়িয়ে রইল, ওকে যা দেবার দাও না হলে বলে দাও–’

‘অথচ এক ফালি বাড়ির ভেতর পাশাপাশি দু–পরিবার থাকি–তবুও এটুকু গোয়ালার আক্কেল নেই ।’

‘তুমিও কি ওদের ডাকো–টাকো না কি কোনো কাজকম্মে?’

‘কেন ডাকব? ওরা ঝিনকু ভরে মধু নিয়ে সুর করে ডাকছে দিনরাত–’

‘এক পক্ষকে প্রথমে শুরু করতে হবে তো–’

‘আমি একা মানুষ, গুষ্টি ডেকে খাওয়াব? ওদেরই তো বরং উচিত আমাদের তিনটিকে ডেকে একটু মিষ্টিমুখ করানো অন্তত । এই মনুকেও তো একদিন ডেকে জিবেগজা, শোনপাপড়ি যা–হোক একটা কিছু, হাতে তুলে দিতে পারত । আমরা তো দিই ওদের ছেলেমেয়েদের, ওরা একটা পিপারমিন্ট লজেনচুসও দিতে পারে না?’

‘যাক গে, মরুক গে, তুমি এখন–’

‘অথচ কত বড় পরিবার; জমজম করছে; কাকে খাচ্ছে, ঘুনে খাচ্ছে, ফোঁপড়ায় খাচ্ছে; চোট্টা শয়তান ওপরপড়া হয়ে খ্যাঁট মেরে উজোর করে দিচ্ছে সব ।’

‘কলটা দেবে না কি, দিয়ে দাও ।’

‘কিন্তু মনটা ওদের লাউয়ের মাচায় কেলে হাঁড়ির মত । সে–হাঁড়িতে তো ভাত ফোটে না, বালি তাতে; জনপ্রাণী পাখপাখালি পালিয়ে যায় সে–হাঁড়ি দেখলে । ভাল কেলে হাঁড়ি পেতে বসেছে বটে সেজবৌরা–’

‘এই মেয়েটির সামনে তুমি অনেক কথাই তো বললে–’

'শুনিয়েই বললাম যাতে ওদের আঁতে লাগে!'

মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়েছিল।

মাল্যবান বললে, 'খুকি; তুমি ফ্রক চিবিও না আর।'

ফ্রকটা সে মুখের থেকে ফেলে দিল। দেখা গেল, দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

মনু বললে, 'পানসে দাঁত।'

'তোমার পানসে দাঁত,' উৎপলা বললে, 'তোমার বাপ–মা ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'না।' মেয়েটি (উৎপলার কেন যেন মনে হল শামকলের বাচ্চার মত) মাথা নেড়ে বললে।

'না?' উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন ফ্রক চিবুচ্ছে দেখছ, শোথ হয়েছে এই মেয়েটার, শরীরে চুনখড়ি নেই; অথচ বছর–বছর না বিয়লেও চলবে না। ওদের বার মাসই কার্তিক মাস, বাবা!' মেয়েটি নিজের অজান্তেই আবার ফ্রক চিবুতে শুরু করেছিল; উৎপলা ফ্রকে একটা হ্যাঁচক টান মেরে বললে, 'দু ধুমসি, খাসির রক্ত মাখিয়েছিস–মেড়েছিস–দু–দু–'

মেয়েটি আস্তে–আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছিল।

'শোনো খুকি,' ডাক দিল উৎপলা।

এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

'সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত ভাল করে ঘষে–ঘষে মেজো দিকিন রোজ। মাজবে?'

শামকলের বাচ্চার মতন তুড়বুড় মাথা নেড়ে মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ'।

'তোমাদের তিনটি বোনকেই তো দেখি আমি, একেবারে লিকপিক করছে; বাঁশপাতা মাছের মতন; চেহারাও তেমনি বিচ্ছিরি। তোমাদের ছোটবোন কেমন হল দেখতে?'

'বেশ সুন্দর।'

'রঙ কেমন?'

'খুব ফরশা।'

'কালো ফরশা তো কথা নয়,' বড় শামকলটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দিয়ে লাল লঙ্কা কেটে খেতে–খেতে বললে যেন চন্দনা, 'মগরাহাটার কুচোচিংড়ির মত হল তো দেখতে। মনে হয় যেন গলার নালী শুকিয়ে থোড়ে আঁশের মত হয়ে রয়েছে। বড্ড দুঃখ করে। বাস্তবিক মানুষের এ কী টোনা টেংড়ি বল তো দিকি–'

মনু একটা ফিক করে হেসে উঠল।

'যে–ফরশা রঙ বলছ খুকি ও তোমার বোনের গায়ে রঙ নেই বলে। দুধে–আলতায় রং–সে এক রকম।'

আবার শামকলের গা মাথা নাড়ল, 'না, আমার বোনের রক্ত আছে ।'

'আছে? তুবও শাদা?'

'খুব শাদা ।'

'তা হলে ন্যাবা হয়েছে ।'

'না, ন্যাবা হয়নি' ফরশা রঙ । কেমন সুন্দর দেখতে! ইশ্, ন্যাবা হবে আমার বোনের?'

উৎপলা বললে, 'কই, দেখালে না তো তোমার বোনকে ।'

'আসুন না, দেখে যান ।'

'এখন দেখতে যাব কেন । খাইয়েছিল? সাধে? যে-দিন হয়েছিল সে-দিন খবর পাঠিয়েছিল?'

মাল্যবান একটু জ্বলে উঠে বললে, 'আ মল যা! ভাল বিপদেই পড়া গেছে দেখছি । সোমত্ত গাইগোরুর মত একটা বাছুরের ঘাড় মটকাবার জন্যে চাট মারছ সেই থেকে! কী হল তোমার ।'

মেয়েটির চোখের ভেতরে যেন তলিয়ে গিয়ে তাকিয়ে থেকে উৎপলা বললে, 'কন্তু, সেলাইয়ের কল নেবার সময়ে ঠিক মতন হাজির হয়েছ তো-শামকলের বাচ্চা ।'

শুনে সচকিত হয়ে কেমন চমকে উঠে তাকাল মেয়েটির দিকে, উৎপলার দিকে, মাল্যবান ।

'তোমার বোন যে-দিন হল, সে-দিন চারটে উলু দিলে কেন?'

'আমি তো দিই নি উলু ।'

'উলুর যা ঘটা! ভাবলাম, এবার বুঝি রাজপুত্তুর এসেছেন?'

মেয়েটি শুকনো রৌদ্রডাঙায় পাখির বাচ্চার মত এক-আধ ফোঁটা মেঘের জল পেয়ে তিড়বিড় করে উঠল উৎপলার কথা শুনে ।

'তোমার মা কল চেয়েছেন কার কাছে?'

'আপনার কাছে ।'

'কী বলে দিয়েছেন?'

'বলেছেন তোর পলা মাসির কাছ থেকে সেলাইয়ের কলটা চেয়ে নিয়ে আয় তো-'

উৎপলার খানিকটা ভাল লাগল, জ্যৈষ্ঠের মাটিতে কিছু আষাঢ়ের মেঘের রস এসেছে যেন, এমনি ভাবে মেয়েটির কোঁকড়া চুল নিয়ে নাড়াচাড় করতে-করতে বললে, 'মাসি হলাম কোন সুবাদে?'

'মা বলে দিলেন তো ।'

'তোমার চুলের ভেতর ঢের উকুন, খুকি ।'

'হ্যাঁ, দিদির মাথার থেকে এসেছে ।'

'কেউ বাছে না তোমার মাথার উকুন?'

'না।'

'উৎপলা বুড়ো আঙুলের নখে একটার পর একটা উকুন টিপে মারতে–মারতে বললে, 'এই যে মাথা বেছে দিচ্ছি তোমার, বেশ আরাম পাচ্ছ না?'

মেয়েটি উৎপলার কোলে মাথা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে রইল।

'তোমার মা কল দিয়ে কী করবেন?'

'জামা সেলাই।'

'কার জন্যে?'

'ছোড়দি, আমি, বোন–তিনজনের জামা।'

'তা, তোমার মা এখনও তো আঁতুড় ঘরে।'

'না, বেরিয়েছেন।'

'কবে?'

'এই তিন–চার দিন হল–'

'নাড়ী তো এখনও বড্ড কাঁচা, সেলাই করবেন কী করে? নাড়ী টনটন করে উঠবে যে।'

'চাইলেন তো।'

'লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ক্ষীর এসেছে–খাবে খুকি?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে, 'খাব।' শামকল শাবকের মাথা কেমন তুড়বুড় করছে, চাঁদির ওপর জলের ফোঁটা রোদে শুকিয়ে গেছে যেন।

উৎপলা হাত ধুয়ে এসে মেয়েটিকে খানিকটা ক্ষীর দিল তারপর কলটা ভাল করে দেখে, মুছে মনুকে বললে, 'যা মনু, কলটা সেজমাসিকে দিয়ে আয়। তোমার ক্ষীর খাওয়া হয়েছে, খুকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগল?'

'বেশ–'

'তোমার নাম কী?'

'নোরা। নোড়া, ভেঙে দেব দাঁতের গোড়া।'

'কী পড়ো?'

'আমি এখনও–ক অক্ষর–'

বলে এঁটো হাত জামায় মুছতে–মুছতে মেয়েটি দৌড় দিল ।

পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি আঁতুড়েই মারা গেল ।

‘আমি তো তখনই বলেছিলাম, এই রকম হবে–’

দুই–তিন দিন উৎপলা কেমন একটা শোকগ্রাহিতায় আচ্ছন্ন (না, বিমুগ্ধ?) হয়ে কাটাল ।

বললে, ‘আমি একটু দেখতেও পারলাম না, আমাকে একটু ডেকে দেখালও না ।’

‘কী করতে তুমি দেখে?

‘এই তো পাশাপাশি বাড়ি–মানুষ জন্মায়–মরে যায়–যেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে, মরবার সময়ে একবার ডাকলেও তো পারত । পরশু রাত তিনটের সময় মারা গেছে বললে ।’

‘হ্যাঁ’

‘কী করছিলাম তখন আমি?’

‘ঘুমুচ্ছিলে,’ মাল্যবান বললে, ‘কত শিশুরাই তো মরে যাচ্ছে ।’

‘খুব কেঁদেছিলেন সেজগিন্নি?’ উৎপলা দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাত–পা নিঝুম করে ছাদের এ–পারে ও–পারে পরপারে শূন্যতার বড় একটা রৌদ্রচাঙাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল ।

‘বড় বৌকে শাড়ি পাঠালে–কোনো খবর–টবর দিল না তো’, মাল্যবান বললে ।

‘খবর দেবার সময় হয়েছে কি?’

‘বাঃ দশ–পনের দিন হয়ে গেল ।’

‘দাদা নিশ্চয় জবাব দিয়েছিলেন’, উৎপলা বললে, ‘কিন্তু পথে চিঠি মারা গেছে ।’

‘তা নয়,’ মাল্যবান একটু কাঁধ নাচিয়ে বললে, ‘পোস্ট অফিসের চিঠি ওঝার বাটির মত চলে । তিন পয়সার একটা পোস্টকার্ড ঝেড়ে দিলে যে মুল্লুকে পাঠাও, ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে ।’

বড় শামকল কেমন ঘাড়ের রোঁ ফুলিয়ে–ফুলিয়ে কথা কইছে শোন–মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল উৎপলা । কিন্তু চিঠি সম্পর্কে কথা বাড়াতে গেল না সে আর ।

‘আঁতুড়ের মেয়েটাকে বাক্স করে শ্মশানে নেওয়া হয়েছিল ।’

‘হ্যাঁ ।’

‘কী রকম বাক্স?’

‘প্যাকিং বাক্স–পাইন কাঠের–’

‘ভেতরে আটকে নিলে? পেরেক ঠুকে?’

‘তবে কি বাক্সের বাইরে লেপটে নেবে গঁদের আঠা দিয়ে লেবেল মেরে?’

'কী করলে তারপর?'

'শ্মশানে নিয়ে গেল–'

'দাহ তো হয় না ছোটদের?'

'না।'

'না? পুঁতি ফেলে তবে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী হবে?'

'কীসের পরে?'

'আমি বলছি, মাটির নীচে কী হবে ওর?'

মাল্যবান এবার চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'ও–সব কথা কেউ ভাবে না। হবেই একটা কিছু। শেয়ালে মাটি খুঁড়ে না খেলে পচে গলে যাবে–কৃমি হবে।'

'কলকাতায় শেয়াল কোথায়? পচে মাটি হয়ে যাবে–'

শুনতে–শুনতে সামনের চেয়ারটায় না বসে মেঝের ওপরই ঝুপ করে বসল উৎপলা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে, বসে রইল।

মাল্যবান চুরুট টানতে টানতে ভাবছিল; কী বোকা! কী বোকার মত কথা জিজ্ঞেস করে। কত রাজ্যি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উৎপলা ফ্যাকড়া নিয়ে বসে আছে, তারপর একেবারেই নয়; একটি সন্তানের মা হয়ে– ও যেমন ভাবে মা হতে চেয়েছিল বহু সন্তানের, তা হতে পারে নি; সেই সব নিহিত তেজ উৎপলার আপাতমূর্খতার অতৃপ্তিতে ঝড়ে পড়ছে।

'আচ্ছা, মরে যাওয়ার পর বড়–বড় মেয়েদের মাটিতে পুঁতলে তারপর কী হয়?'

'মাটিতে পুঁতবে কেন? দাহ হয়।'

'না, আমি বলছি, যাদের ভেতর দাহ–টাহ করার চল নেই, তাদের কথা–'

'ওঃ', মাল্যবান একটু পুরুষোচিত তীক্ষ্ণ ভাবে উৎপলার দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি–একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেলবেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। তারপর সবাই চলে গেল, যে যার গাঁয়ে। সেখানে আট–দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধ্যের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মড়াকে চুরি করে নিয়ে গেল। কেন নিল, বল তো?'

'কুড়ি–একুশ বছরের মেয়েমানুষ?'

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দরী ছিল, বেশ সোমত্ত; শবটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও গা ফুটে রূপ বেরুচ্ছে; আর গতরের সে কী পুষ্টতা ।'

'এই জন্যেই চুরি করা হয়েছিল–' মাল্যবান বললে ।

মাল্যবানকে খুব বেশি জাগিয়ে দিয়েছে উৎপলা, কথায়–কথায় নিজেও খুব বেশি জেগে পড়েছে আজ ।

নীচের ঘরে আর যেতে দেওয়া হল না মাল্যবানকে আজ রাতে । এ–রাতটা মাল্যবান ও উৎপলার বেশ নিবিড় ভাবেই কাটল । সমস্ত রাত–সমস্তটা শীতের রাত ।

মাল্যবান যা–ই মনে করুন না কেন, স্ত্রী–সন্তানের পাট চুকিয়ে দিয়ে একা–একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানো খুব শক্ত হত তার পক্ষে । গোলদিঘিতে ঘুরে–ঘুরে বার–চৌদ্দ বছর সে অনেক হাওয়াই ফসল ফলিয়ে গেছে; সমাজসেবা, দেশস্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা, বিপ্লবের তাড়নাতেজ, নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা, উনিশ শতকের নিশায়মান সমুদ্রতীর; সাহিত্যের, ধর্মের, মননের; বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্ত, রৌদ্র, ছায়া, জ্বালা, সমুদ্রসংগীত–নানা রকম অপর রকম জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ঈর্ষা করেছে–নিজের জীবনটাকে অনেক সময়েই অসার ও নিস্ফল মনে হয়েছে তার । কিন্তু, তবুও, এই পাকা চাকরিটুকু, স্ত্রী ও মেয়ে, কলেজ স্ট্রিটের ঘর তিনখানা, এর চেয়ে অন্য কোনো সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি?

সে নিজে যখন খুব স্থির হয়ে ভাবে, বোঝে–জীবনের কাছ থেকে যথাযথ প্রাপ্য সে পেয়েছে । সে জানে, জীবনটা তার এর চেয়ে ঢের খারাপ হতে পারত । যদিও মৃগনাভির গন্ধে মাঝে–মাঝে অধীর হয়ে উঠে গোলদিঘিতেই এই নিজের একতলার ঘরের রাতের বিছানায়ই সে পাক খেয়েছে সব চেয়ে বেশি, কিন্তু তবুও সে বুঝেছে যে, তার নিজের সাংসারিক জীবনটা কস্তুরীমৃগ নয়, বেসংসারীও নয়; সাংসারিক সফলতার চূড়ান্তে উঠে যে–সব লোক টাকাকড়ি যশ মদ মেয়েদের নিয়ে সন্তপ্ত হয়ে আছে দিনরাত, তারা কি জানে তারা কী, কে, চলেছে কোথায়! তারা জানে না । তাদের অন্তঃশীলা আত্মা ঠিক নয়–তাদের নিম্ননাভির গন্ধ এ–দিকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে তাদের; মাঝে–মাঝে মাল্যবানের মতন পথের পাশের একজন লোককেও সচকিত, আলোড়িত করে তুলছে । কিন্তু মাল্যবান জানে, এ–নাভি তার নিজের নয়–এসব ওদের ।

একদিন মা বেঁচেছিলেন । মা খুব স্নেহ সরসতার মানুষ ছিলেন; কিন্তু তখনই কলকাতায় প্রথম চাকরি শুরু করে মার সঙ্গে শ্যামবাজারের একটা একতলা বাড়িতে এক কোঠায় যে–দিনগুলো কাটিয়েছে সে–প্রত্যেকটা দিনের কথা মনে আছে তার; সহজ কঠিন মৃদু নিরেস, কেমন নির্জলা জলীয় দিনগুলো

জীবনের। ভাবত, মাকে মানুষ সূতিকাঘরের থেকেই পায় কি না–রোজই পায়–অনেক পায়–জননীগ্রন্থি কেটে যায় তাই শিগগিরই–নতুনত্ব হারিয়ে যায়। ভাবত, মানুষের জীবনের এমন একটা সময় আসে, যখন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই আলো–জল–বাতাসের মত সুলভ মনে হয়; একজন অপরিচিত মেয়েকে মনে ধরলে তার সহজ স্বাভাবিক সত্তাকে পায়ের নীচের মাটির, মেটে খুরির জলের মত সহজ ভেবে নিতে সময় লাগে; কাছে থাকলেও দূর–তার স্বচ্ছ সরল প্রকাশ ভানুমতীর খেলার মতই আপতিত হচ্ছে কী সহজে–কিন্তু তবুও কী রকম আঁধার, কঠিন, নিবিড়।

এইসব ভেবে–ভেবে কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ত মাল্যবানের মন; মার কাছে ঘাট হয়েছে বলে তার প্রতি শ্রদ্ধায়, পথে–ঘাটে মনে–ধরে গেছে নারীটির প্রতি উদাসীনতায় এবং নিজের প্রতি ধিক্কারে নিজেকে সে সজাগ করে রাখত।

মাল্যবান যখন বিয়ে করে নি, নিজের অফিসের বিবাহিত কেরানিদের হপ্তাকাবারি অভিযান দেখে মন এমন গুমরে উঠত তার। উৎপলাকে নিজের ঘরে আনার থেকে আজ পর্যন্ত যখনই কোনো মানুষের স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনেছে, মাল্যবান, সে মানুষটিকে জাদুঘরের কূলকিনারায় দেখা অতীব মৃত জিনিসের মত অতীতের আনন্ত্যের কুয়াশা–ঘরে লীন হয়ে থাকতে দেখছে সে–অনুভব করেছে, ও–মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই; সে-জীবনের শূন্যতা কল্পনা করে, অস্বস্তি বেদনার অভিজ্ঞতায় কেমন যেন অন্য আর–এক রকম ধার শানিয়ে উঠেছে তার। নিজের স্ত্রী যে বেঁচে আছে, এ–সান্ত্বনা ভেতরে–ভেতরে গুছিয়ে নিয়ে সারাদিন আফিসের ডেস্কে, সারারাত নীচের ঘরের বিছানায় কম্বলের নীচে, নিশ্চুপ শান্তির ভেতর একটার–পর একটা বিদায় দিয়েছে–গ্রহণ করেছে।

এই সব হচ্ছে মাল্যবানের জীবনের ভিতরের কথা, ভিত্তিচিত্রের কথাও। সে একা থাকতে পারে না, মার সঙ্গে থাকে তাই, কিন্তু তবুও মায়ের ভালবাসা সান্নিধ্য তার কাছে কালক্রমে একা থাকার সামিল বলে মনে হয়; বিয়ে না করলে তার চলে না; স্ত্রীকে ঘুচিয়ে দিয়ে একা চলবার কোনো শক্তিই তার নেই।

কিন্তু জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই দাম্পত্যজীবনেরও নানা রকম খাঁকতি দেখছে সে। ঝড়তি–পড়তি নষ্ট ফসল, পচা হাড়মাংসের গন্ধে ভরে উঠেছে সব। উৎপলার উদাসীনতা ঠিক নয়, খুব সম্ভব অপ্রেম–দিনের পর–দিন স্বচ্ছ হয়ে আসছে যেন। অতল স্বচ্ছলতায় যে–রূপ দেখা যাচ্ছে তার, তাতে মনে হচ্ছে, কোনোদিনই প্রেম–প্রীতি ছিল না মাল্যবানের জন্যে উৎপলার। না থাকলে না থাকবে। অন্যদের জন্য প্রীতি? অন্য কারো জন্যে প্রেম? তাই হোক। কিন্তু তবুও উৎপলাকে বহন করে বেড়াতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত? উৎপলাও তাকে তাই করবে বুঝি? চোখের সামনে অন্যদের প্রতি উৎপলাকে স্পষ্ট অনুরক্ত হয়ে পড়তে দেখে–সে–জায়গা থেকে একটু গা বাঁচিয়ে সরে যেতে হবে বুঝি মাল্যবানকে? আলখাল্লাপরা

একজন চীন, একজন গ্রীক দার্শনিকের মত আকাশের তারা, পাতালের বালি, মানুষের জীবনের মিছে সমারোহকে যে নিমেষেই গ্রাস করে চলেছে সেই উপলব্ধিতে স্থির হয়ে নিতে আবার–তারপর বেশি রাত হলে টেবিলে খেতে বসে খোশগল্প করতে হবে স্ত্রীর সঙ্গে আর মেয়ের সঙ্গে?

বিয়ের আগের দিনগুলোকে তার শীতের আগে হেমন্তের, হেমন্তের আগে শরতের খেতে, মাঠে, রোদে মানুষের মুখে পাখির কথায় যে অধিনশ্বর সম্ভাবনা থাকে হেমন্তের, যে মহাপ্রাণ কুহক থাকে আসন্ন শীতের রাতের, সেই রকম মনে হয়েছে–

চলে যেতে পারে সে কি আবার বিয়ের আগের সেই পৃথিবীর দেশে? প্রশ্নটা পাড়া মাত্রই তার উত্তর মেলে; মানুষ তো মৃত্যুর দিকে এগচ্ছে, পিছে ফিরে যেতে পারে না তো সে আর। তবে উৎপলা মনুকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগতে পারা যায় বটে–একা। মার আমলে পারে নি, বৌ পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে; সজ্ঞানে হেঁটে চলে যেতে পারে সে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে–অজ্ঞান মৃত্যুর দিকে। পারে।

কিন্তু সাময়িক এই সব ইচ্ছা, চিন্তা। মাল্যবানের মনের ভেতর কোনো পৃথিবী ঘুরে বিদ্রোহী বা ভাবুক নেই যে তা নয়; শয়তান জোচ্চোর অমানুষও রয়েছে, কিন্তু সবের ওপরে মানুষ সত্য হয়ে রয়েছে; একজন সাধারণ ধর্মভীরু ও ভীরু মানুষ। একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু ভীরু বৌ যদি সে পেত, তা হলে এ–দুটি শাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দান না রেখে শান্ত ভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন কড়ের চমৎকার অগ্নি–ডাইনির মত হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আর বিবাহিত জীবন।

উৎপলা দেখতে বেশ; শুধু বেশ বললে হয় না–এমনিই বেশ। সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধির ধার মাঝে–মাঝে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; হৃদয়ের বিমুখতা ও কঠিনতাও তার এক–এক জায়গায় এক–একজন মানুষের তাপ বা জ্ঞান–পাপের ছোঁয়ায় মোমের মত গলে দাম্পত্য আবহে ফিরে এসে মোমের মত শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে আবার। কুমারী হিসেবে এই মেয়েটির বেশ দাম ছিল–নারী হিসেবেও। কিন্তু মাল্যবানের মত এ–রকম একজন লোকের বৌ হয়ে ঠিক হল না তার। উৎপলার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। বাপের বাড়ির দেশের ঢের লোক তাকে চেনে–ভালোবাসে–কাছে আসে তার; কলকাতায় এসে এদেরই মারফত আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার; দশ–পঁচিশ মিনিট উৎ, পলা, উৎপলা, ইত্যাদির সঙ্গে একশ রকম মানুষ একশ রকম ভাবের কথা বলে যাবার প্রয়োজন প্রায়ই বোধ করে; এই সব বিমিশ্র ভিড় এক সময় খুব বেশি আসত; আনাগোনা এখন খানিকটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে; শিগগিরই বাড়বে আবার তাও মনে হচ্ছে। যারা যাওয়া–আসা করে এ বাড়িতে–কেউ থাকে পনের মিনিট, কেউ দু–তিন ঘণ্টা। সটান দোতলায় উৎপলার কাছে চলে যাওয়া প্রায় সকলেই তারা; মাল্যবান নীচের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, চুরুট

টানছে, দেখে বা না দেখে তারা সবটুকু দেখে নিয়েছে অনুভব করে, কৌতুক বা ক্লান্তি বা কঠিনতা বোধ করে। কিন্তু মাল্যবানের সঙ্গে বিশদ আলাপচারির আবশ্যকতা কেউই বড় একটা বোধ করে না। কেউ–কেউ এ–ও জানে যে, এ–মানুষটিকে এর স্ত্রী একেবারেই গ্রাহ্য করে না। এরকম উপলব্ধির পর সময়ের, পৃথিবীর স্তনাগ্রচূড়ায় অনতিদূর শঙ্খিনীকে ঢের বেশি সরস বলে মনে হয়–ভীরু দুরুদুরু বুকের সাহস ও কাম নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে–যেতে। মাল্যবান দেখেছে, জেনেছে, উপলব্ধি করে দেখেছে সব দেখেছে, তার চেনা–আধোচেনা মানুষেরা কী রকম অনিমেষ বিদ্যায় ওপরে চলে যাচ্ছে–তাদের কী রকম তাগিদ–কত তাড়া! সে যে নিজে একজন প্রাণী নীচের ঘরে রয়েছে–এ বাড়িটাও যে তার সেটা কোনো কথা নয়–কথাটা সত্যিই খুব ঠিক।

যারা ওপরে যায়, তারা কেউ লজ্জিত হয়েও ফিরে আসে না তো? কেউ–কেউ অনেকক্ষণ তো বৈঠক জমায়; হাসি তামাশা রগড় গুণা ছিটোফোঁটায় ফেনায় ছিটকে আসে নীচের ঘরে; মাল্যবান মাঝে–মাঝে অবাক হয়ে ভাবে–কথা ভাবে। কথা ভাবা কালোধুমসো পাখিদের নীড় তার মাথাটা। আচমকা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বা দড়াম করে জানালার কপাটটা খুলে ফেলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেয় সে। যারা ওপরে যায়, তাদের পেছনে–পেছনে সে ওপরে যায় না কোনোদিন; কাউকেই কিছু বলতে যায় না। যখন দোতলার ঘরে আসর খুব জমে উঠেছে, তখনও ওপরে যেতে কেমন দ্বিধা বোধ হয় তার; যখন রাত বেশি, উৎপলার ঘরে লোক কম–দুটি কি একটি–খুব সম্ভব একটি–তখন সে কিছুতেই ওপরে যায় না; মন দিয়ে করেছে, চোখ দিয়ে সকলের জীবনের সব তলানি আবিষ্কার করতে চায় না।

চৌবাচ্চায় স্নান করে ঠাকুরের কাছ থেকে ভাত নিয়ে খেয়ে সে অফিসে চলে যায়। কিংবা সন্ধ্যেবেলা যখন ওপরের আড্ডা জমে, তখন আস্তে–আস্তে স্টিক হাতে গোলদিঘির দিকে চলে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে; কটা দিন আর? এই স্কোয়ারে পাক খাচ্ছি–চোখের পলকেই কুড়িটা বছর সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে আমার, উৎপলার; দেখতে–দেখতে চুল পেকে যাবে ওর, দাঁত পড়ে যাবে, তারপর সব ভোঁ–ভোঁ। ভাবতে–ভাবতে কুড়ি বছরের পাল্লা সত্যিই, দেখ, পেরিয়ে গেছে সে–জীবনটা এখন বেশ নিরালা, নিঃশব্দ; একটা অতিরিক্ত কাক, একটা ওপরপড়া বেড়াল নেই কোথাও; রোদে বাতাসে নির্ভাবনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে; যত চাও, তত! কত নেবে? ভাবতে–ভাবতে ক্ষমার ক্ষমতায় বোশেখ–জ্যৈষ্ঠের মাটির শিরায়–শিরায় শ্রাবণের রস এসে পড়ে যেন। চুরুট জ্বালিয়ে নেয় মাল্যবান।

কুড়ি বছর তো পেরিয়ে গেছে সে আর উৎপলা। গত কুড়ি বছর যে–সব আতিশয্যচক্র হয়ে গেছে উৎপলার জীবনে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন আর। গোলদিঘির রাতে, শীতে মাল্যবানের চুরুট তার মনের ভেতরে সেই ছেলেবেলার শীতরাতে শান্তর মার আগুনে খাপড়ার মত কেমন একটা

নিঃশব্দতা নিশ্চয়তা শান্তির অবতারণা করছিল। বাড়ির দিকে হাঁটতে–হাঁটতে বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে পড়ে মাল্যবান বলেছিল, কাকে যেন বলছিল; ‘কী গো, গোলামরা সব চলে গেছে–রঙের গোলামও–বল। বিশটা বছর হসকে গেছে চোখ না পাঁজলাতেই। মনু শ্বশুরবাড়ির, আর আমাদের বাড়ি সায়েব বিবি ওপরের ঘরে–বলো! বিছানাটা বেশ দুজনের মতন উম্‌–উম্‌, কুসুম–কুসুম, শীত–রাত আর শেষ নেই বলো?’ দুপুর–রাতে ঠাণ্ডা নদীর পারে শামকলের মাথাটা যেন ঢেঁকির পাড়ের মত উঠছিল পড়ছিল, যখন ‘বলো–বলো।’ বলছিল মাল্যবান। কথা বলতে–বলতে মাল্যবান হি–হি করে নিজের ঘরে ঢুকে লেপ নেয়; খুব বেশি অন্ধকারে খুব বেশি ঘুমের ভেতরে মানুষের শরীর বলে কোনো জিনিস থাকে না, মনটাও কাঠ হয়ে যায়, হঠাৎ জেগে উঠলে কাঠে আগুন লেগে যায়; আচমকা জেগে–জেগে ওঠে সারারাত, পুড়তে–পুড়তে সকালবেলা মাল্যবান জাগ্রত চেতনার অন্য আরেক রকম আগুনের ভেতর জেগে উঠল। এখানে ‘বলো–বলো’–র চালাকি চলবে না শামকল শালার; প্রতিটি সেকেন্ড–মিনিট গুনে–গুনে অগ্নিকৃকলাসকে রূপকের মিথ্যে বলে বিদায় দিয়ে, আগুনকে সত্যিই আগুন বলে গ্রাহ্য করে পদে–পদে এগিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো পথ নেই আর।

একদিন মাল্যবান অফিসে গিয়ে শুনল যে, অফিসের কেরানী মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর ভয়ঙ্কর অসুখ–মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছে।

‘ঘাবড়াবেন না মনোমোহনদা, সেরে যাবে–,’ বললে মাল্যবান।

কিন্তু সেদিন সমস্তটা দিন অফিসে মনটা তার উৎপলার জন্যে কেমন অসুবিধে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সন্ধ্যের সময়ে বাসায় গিয়ে পোশাক না ছেড়েই সে ওপরের ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল, উৎপলা আর মনু ছাদে বসে আছে–কার অসুখ, কোথায়?

‘তুমি ভাল আছ তো উৎপলা? আমাদের অফিসের মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর বড্ডা অসুখ–’

‘কী অসুখ, বাবা?’ মনু জিজ্ঞেস করল।

‘সে কী–এক রকম অসুখ, স্টোন হয়েছে–’

‘সে আবার কী?’

‘কী জানি।’

মাল্যবান খানিকক্ষণ আলো–আবছা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভারি ভাবুক হয়ে পড়ল; একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'মনু, যা আমরা খাই, তার ভেতরে নানা রকম জিনিস থাকে, হজম হয় না, ভেতরে–ভেতরে স্টোন হয়–'

'পেটে হয় স্টোন?'

'না, পেটে না, কিডনিতে হতে পারে–গলব্লাডারে হতে পারে–'

'কিডনি কী, গলব্লাডার কী–?' জিজ্ঞেস করাতে মাল্যবান হাত দিয়ে নিষেধ জানিয়ে বললে, 'ও–সব তোমার জানবার দরকার নেই–'

'ভাতের ভেতর যে–কাঁকর থাকে, সেগুলো জমে গিয়ে বুঝি কিডনিতে?' মনু বললে ।

'না, তা নয়, তা ঠিক নয়–'

'ও তো আমার পেটেও হাতে পারে–' উৎপলা বললে ।

'না, তা কী করে হবে, উৎপলা–' মাল্যবান শিশুর মুখে ভূতের গল্প শুনে একটু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে ।

'হবে না? তোমার ঠাকুর খুব দেখে–শুনে চাল ধোয় আর ভাত রাঁধে, উৎপলা বললে, 'এক–একদিন খেতে বসে দেখি কাঁকর পাথরের কাঁড়ি ।গ্রাসে–গ্রাসে পেটে হকাচ্ছে, স্টোন হবে না তো কী হবে–'

'ওতে স্টোন হয় না–ওটা–' যা হোক মাল্যবান ঠাকুরকে ডাক দিল ।

'ভাতে কাঁকর থাকে কেন?'

ঠাকুর আপত্তি করতে যাচ্ছিল, মাল্যবান বললে,' ফের যদি কাঁকর পাথর নুড়িকুচি কিছু দেখি, তা হলে তোমার মাইনে কেটে তোমাকে তাড়িয়ে দেব আমি । খবরদার ।'

ঠাকুর চলে গেলে উৎপলা বললে, 'ওকে বকে কী লাভ । যারা চাল নিয়ে বজ্জাতি করে সে–সব ওপরওয়ালাদের পেটের ভাত চাল করে ছাঁকব আমাদের চালুনিতে; নাও, সে–সব পেটোয়া চাল কয়েক বস্ত া নিয়েসো দিকি । পারবে? মাঝখান থেকে ঠাকুরটাকে ঝাড়লে । কী রকম বেকুব তুমি ।'

'এবারে আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব,' অফিসের ধরাচূড়া–পরা মাল্যবান একটা হাই তুলে বললে ।

যে–আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে উৎপলাকে সে দেখতে এসেছিল, তা তার ধীরে–ধীরে ধোঁয়ার ভেতর মিলিয়ে যেতে লাগল । যেন মনোমোহনের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে সমস্তটা দিন অফিসের কাজকর্মের ভেতর উৎপলার জন্যেও যে দুশ্চিন্ত হয়েছিল, বৌয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ খিটিমিটি করে সেই বিষণ্ন, ভাল জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল একেবারে । খারাপ হল–খুব খারাপ হয়ে গেল সব । অফিসের থেকে এ–রকম হ্যাঁচকা ছুটি নিয়ে বাড়িতে না এলেই ভাল হত ।

‘স্টোন হয়েছে–তারপর কী হল–মরে গেল?’

‘না মরবে কেন? তা হলে বেচারির চলবে কী করে?’

‘কোন বেচারির?’

‘মনোমোহনদার।’

‘মনোমোহনবাবু তোমাদের অফিসের কেরানী?’

‘হ্যাঁ, নীচের দিকের; মাইনে পঞ্চান্ন টাকা; বড্ড মুশকিল মনোমহোনদার।’

‘মনোমোহনবাবুর বৌয়ের জোর কপাল বলো–’

‘কেন?’

‘পারানির দিকে চলেছে–বৈকুণ্ঠে যাবে–কেরানির টাকায় টিকছে না আর–’

উৎপলা হাঁসফাঁস করে বললে, ‘পেটে আমার কী যেন হয়েছে, মনে হয়–’

‘কী হল?’

টিউমার হয়েছে সামনে হয়–’

‘কে বললে?’

‘বলবে আবার কে?’ টের পাচ্ছি। এর অষুধ কী? অপারেশন করতে হবে?

মাল্যবান সন্দিগ্ধ চোখে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল, সত্য কথা বলেছে? কী করে বুঝবে, কথাটা অসত্য? সুবিধের লাগছিল না তার। কোনো কিছু স্থির করে নয়, এমনিই কথা একটা–কিছু বলতে হবে বলেই মাল্যবান বললে, ‘ও টিউমার নয়। ও কিছু নয়। ও তোমার মনের ধোঁকা।’

উৎপলা কথা খরচ করতে গেল না আর। মেঝের ওপর বসেছিল–বসে–বসে হাঁসফাঁস করতে লাগল; উঠে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

চার–পাঁচ দিন কেটে গেছে। মাল্যবানের কেমন যেন–কেন যে, কিছুই ভাল লাগছিল না।

‘চলো, আজ একটু বেরিয়ে আসি–’

‘কোথায়?’

‘চলো, আজ একটা গড়ের মাঠের দিকে যাই–’ মাল্যবান বললে।

‘থাক।’

‘চলো, ভরসাঁঝে এ–রকম একা–একা ছাদে বসে থাকলে মন খারাপ লাগবে–’

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়ে বড় বাতাসে ফুল ধরা বাবলার মত হুড়মুড় করে কেঁপে পাক খেয়ে উঠে বললে, 'এই যে ছিরঙ্গ–ঠাকুরপো একটা বেহালা এনেছ দেখছি–' শ্রীরঙ্গ বললে, 'হ্যাঁ, কিছু দিন থেকে শিখছি–আচ্ছা, দেখ, কেমন বাজাই–'

'আচ্ছা কেত্তনের সুরই ধরছি।'

'কোচে বসো ঠাকুরপো। বাঃ, দাঁড়িয়ে কেন?'

'আমি দাঁড়িয়েই সুবিধে পাই; দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে নবনী মল্লিক বেহালা বাজায়। আমায় শিখিয়েছে সে।'

'নবনী?' পুরুষ না মেয়ে?' মাল্যবান জিজ্ঞেস করল।

'অবনী যদি পুরুষ হয়, তাহলে নবনী কী হবে?' আড়চোখে মাল্যবানের দিকে একবার তাকিয়ে বিদ্যুতের ভরা ব্যাটারির মত সম্পন্ন সফল দৃষ্টিতে উৎপলার দিকে তাকাল শ্রীরঙ্গ।

'অবনী নবনী দুভাই? নবনীবাবু আপনার দাদা?' মাল্যবান বললে।

'আমি তো মল্লিক নই।'

'তবে?'

'পলা বৌদি জানে আমার কুলের খবর–'

'ওরা রামবাগানের দত্ত,' উৎপলা বললে।

উৎপলা শ্রীরঙ্গকে জিজ্ঞেস করলে, 'নবনী কি মল্লিকবাড়ির মেয়ে, রাজেন মল্লিকের–'

'হবে এক মল্লিকের; ব্যাটাছেলে নয় নবনী, মেয়ে বটে। পলা বৌদি, বেহালাটা বাজাই তা হলে?' ঘাড় কাত করে গোলাপজাম কমরাঙা লটকান বনের কেমন এক অমায়িক হলুদ পাখির মত জিজ্ঞেস করল শ্রীরঙ্গ।

'বাজাও–বাজাও।'

'কেত্তনের সুর?'

'বাজাও।'

'না, কেত্তনের সুর নয়–' উৎপলা নিজেকে তাড়তাড়ি শুধরে নিয়ে বললে।

'কেন?'

'বেহালায় তা বাজবে না। তুমি একটা অন্য সুর বাজাও শ্রীরঙ্গ ঠাকুরপো। যাকে বলে বেহালার সুর–'

শ্রীরঙ্গ বেহালা কাঁধে গুণীর মত দাঁড়িয়েছিল। এবারে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল–বাঁ পা পিছনের দেয়ালে ঠেকিয়ে, 'ব্যয়লার সুর মানে?'

'মনোমোহন ব্যয়লাদারকে চিনতে তুমি' উৎপলা বললে।

'না তো । কোথাকার?

'চব্বিশ পরগনার । আমি তাকে প্রায়ই একটা চমৎকার সুর ভাঁজতে বলতাম । কোনো গানের সুর সেটা নয় । সেটা ব্যয়লার সুর । মনোমোহন মন্ত্রী লোকটার নাম ।'

'ঐ একই সুর বাজাত?'

'একই সুর ।'

'বরাবর?'

'বার মাস । আমাদের দেশের বাড়িতে শীত পড়লে আসত । কার্তিক মাসটি কাটিয়ে যেত । লোকটার নাম যা বললাম, মনে আছে তোমার?'

একটা শামুক; না, কী যাচ্ছে, দেখাবার জন্যে হাঁসের মত ঘাড় কাত করে শ্রীরঙ্গ ঘাড়টাকে আবার সোজা করে নিয়ে বললে, 'মনে আছে, মনোমোহন মন্ত্রী । এইবার বাজাই?'

'বাজাও । বাজাও । আয় মুন, আয় । নবনী মল্লিক রাজেন মল্লিকের বাড়ির, না?

'না ।'

'তবে?'

'ওদের বাড়ি জলপাইগুড়ি না কোথায় যেন ছিল; এখন কলকাতায়ই থাকে । ও হল কেষ্ট মল্লিকের মেয়ে, টালিগঞ্জের ।'

'বড়-সড় মেয়ে?'

'মনুর চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে ছোট, বেশ সোমত্থ মেয়ে । ভারি সুন্দর । টলটলে মাকালের মত যেন তেল চুয়ে পড়ছে চামড়ার থেকে; হাত বুলিয়ে নিলে ঘাসের শিশির উঠে আসে যেন ভোরবেলার । ভাল বাজিয়ে । মোক্ষম গাইছে, মাইরি । আমি ওকে আমার গাইয়ে বৌ বলি-'

'ওকে বিয়ে করেছ তুমি?'

'না । এমনিই মশকরা করে বলি ।'

শ্রীরঙ্গ বললে, 'বেয়ালার আর্টিস্ট কাউকে বিয়ে করে না । অবিশ্যি তোমার মতন কাউকে পেলে বিয়ে করে, কি, না করে-বছরে কত দিন শনি-মঙ্গলবার টের পাইয়ে দিত আমাকে-কিন্তু কাউকে কোথাও পেলুম না-দেখলুম না তো তোমার মত ।'

এ-রকম কথা শুনে নাক-মুখ লাল হবার বয়েস না থাকলেও সেই বয়েসের যে রক্ত এখনও আছে উৎপলার, চমকে উঠেছিল ।

'সেই মাঠকোঠা, নেবুতলা, শোভাবাজার, পাথুরেঘাটা, কুমারটুলি, আহিরিটোলা, বৌবাজার, চিৎপুর, হাতিবাগান, রাজাবাজার, ধর্মতলা–সমস্ত কলকাতা আমার পায়ের নীচে পলা বৌদি–কিন্তু তোমার মতন এমন হাতি খেতে কাউকে তো দেখলুম না।'

উৎপলা একহাত পেছিয়ে চমকে উঠে বললে, 'হাতি খেতে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক দূরের সমুদ্রে শ্রীমন্ত সদাগর যেমন দেখেছিলেন–'

উৎপলা খানিকটা বিলোড়িত হেয় উঠে বললে, 'তুমি বুঝি শ্রীমন্ত সদাগর?' বেহালায় একবার ছড়ি টেনে উৎপলার দিকে চোখ তুলে শ্রীরঙ্গ বললে, 'আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের ওপরে, কিন্তু হাতি খাচ্ছ কেন, বলো তো কামিনী–'

'কমলে কামিনী বলো,' উৎপলা ফোঁড়ন দিয়ে বললে, 'কামিনীনয়। দেখছ না ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন–'

একটু এগিয়ে চাপা গলায় বললে শ্রীরঙ্গকে।

শ্রীরঙ্গ বেহালায় এবার একটা সুরই ভাঁজতে লাগল–খুব মন দিয়ে, কিন্তু তার চেয়েও নিবিদ নিবেশে মননের অপর বস্তুতে লেগে থাকতে চেয়ে; বুঝছিল উৎপলা, অনুভব করছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেথ–শ্রীমন্ত সদাগর দেখলেন,' শ্রীরঙ্গ চোখ বুজতে–বুজতে চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি হাতি খাচ্ছ কেন, পলা?'

'কী খাব তা হলে?' শ্রীরঙ্গের দিকে তাকিয়ে, মাল্যবান যে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা জানতে না চেয়ে নিজেকে একটু বেশি ছেড়ে দিয়ে বললে যেন উৎপলা।

'শ্রীরঙ্গ হঠাৎ চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'ওঃ এই যে মাল্যবানবাবু; এখানে দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি; আমার চোখেই পড়েনি। আচ্ছা, বাজাই বেশ দুর্দান্ত একটা গৎ। শোন মনু, শোন মনুর মা, শুনুন মাল্যবানবাবু।'

রাত দুটোর সময় খুব কাছাকাছি কোন বাড়ির ভেতর কান্নাকাটি পড়ে গেল; মাল্যবানের ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি বিছানার থেকে উঠে কম্বল গায়ে দিয়ে সে দরজা খুলে রাস্তায় নামল। তাকিয়ে দেখল ধীরেনবাবুদের সদর দরজার কাছে ভিড় জমে গেছে। ঢুকে দেখল, একটি মেয়েমানুষের শব নীচে নামানো হয়েছে–মেয়েটির বয়েস পঁচিশ–ছাব্বিশ হবে হয়তো, এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ–কাপল চুল সিন্দুরে মাথা–মাখা–দেখে তার প্রাণের ভেতর কেমন যে করতে লাগল! অন্ধকার শীতের ভেতর সে চুপে–চুপে

নিজের ঘরে ফিরে এল আবার; খানিকটা সময় অবসন্ন হয়ে নিজের বিছানার ওপর বসে রইল; তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে–ভাঙতে ওপরে গিয়ে দাঁড়াল।

মাল্যবান দেখল, উৎপলা আর মনু বিছানায় উঠে বসে আছে। একটা চেয়ারে বসে মাল্যবান বললে, 'আমিও ভেবেছিলাম, তোমাদের ঘুম ভেঙে যাবে–'

'কারা কাঁদছে?'

'ঐ ধীরেনবাবুদের বাড়ি–'

'কী হল?'

'সত্যেনের স্ত্রী মারা গেছে।'

'আহা, সেই রমা!'

'হ্যাঁ।'

'কীসে মরল?'

'জানি না তো।'

'বাঃ আমরা জানতেও পারলাম না।'

'হঠাৎ হয়ত মারা গেছে–কোনো রোগ হয়েছে বলে শুনি নি তো।'

'হার্ট–ফেল করল। কিন্তু ওর স্বামী তো পুরুষমানুষ যাকে বলে। গলায় গামছা দিয়ে মেয়েমানুষকে ও–রকম জামাই টেনে আনতে দেখিনি তো কোথাও–অনেক জামাইষষ্ঠী তো দেখলুম–' উৎপলা বললে।

'এবারকার জামাইষষ্ঠী হয়ে গেছে, মা? কী মাসে জামাইষষ্ঠী হয়, মা?

মনুকে কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে উৎপলা বললে, 'সুখের পায়রার ঘাড়ে সোহাগের পায়রা করে রেখেছিল তো বৌকে। মেয়েটা এ–রকম ভিরমি খেল কেন গা।'

'কীসে কী হয়েছে, কে জানে,' চানের সময় সমস্ত মুখে সাবান মাখতে–মাখতে মানুষ যেমন সংক্ষেপে কথা সারে, তেমনি ভাবে বললে, মাল্যবান।

'আহা, দুটো কচিকাঁচা মেয়েও তো রয়েছে, ওদের কী হবে?'

'সকলে মিলে দেখবে। অমন বাবা আছে। ঠাকুমা, পিসিমারা রয়েছে, যেমন চোখে সাবান না যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে কটাকট–কটাকট কথা বলছে মাল্যবান–চানের সময় যেন–মনে হচ্ছিল।

'তা পাড়াপড়শি মরেছে, যেতে নেই?'

'আমি গিয়েছিলাম।'

'গেলে তো চোরের মত, চলে এলে আর?'

'তোমাদের একা ফেলে এ–রকম অবস্থায় বেশিক্ষণ তো সেখানে থাকা যায় না ।'

আহা–হা, শিমুলের তুলো উড়তে–উড়তে মাদারকাঁটায় গিয়ে ঠেকেছি আমরা । ধনেশপাখি এসে ঠোঁট নেড়ে খসিয়ে দেবেন–' উৎপলা এক গা. জ্বালাতন বেড়ে দাঁতে দাঁতে ঘসে বললে ।

'আহা-হাঁ!–আহা-হাঁ!–' বলতে লাগল উৎপলা ।

'বিছানার থেকে নেমে আলনার থেকে একটা ধোসা পেড়ে গায়ে বেশ আঁটোসাঁটো জড়িয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'আয় তো মনু কোটটা গায়ে দিয়ে ।'

মনুকে নিয়ে ধীরেনবাবুর বাড়ির দিকে রওনা দিল সে ।

লৌকিকতা রক্ষা করছে, ভালই, ভাবছিল মাল্যবান; কিন্তু মানুকে সঙ্গে নিচ্ছে? কেন? সামাজিকতা রক্ষার জন্যই শুধুই যাচ্ছে না উৎপলা–যাচ্ছে দশ–পাঁচ রকম দেখবে বলে; হৃদয় আধার উৎপলার, বাইরের পৃথিবীটাও খুব সক্রিয় (আজ দুপুর–রাতেও), কয়েক ঘণ্টার খোরাক জুটল উৎপলার । মাল্যবান অন্ধকারের ভেতর একটা বিড়ি জ্বালাল । কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজায় তালা মেরে ধীরেনবাবুদের বাড়িতে যাবার মাঝরাস্তায় উৎপলাকে পেয়ে বললে, 'এই নাও চাবি ।'

'চাবি আমি কী করব?'

'নাও । আমি শ্মশানে যাচ্ছি ।'

উৎপলা ঠোঁট রসিয়ে বললে, 'পাড়ায় আর বামুন নেই, কাশীঠাকুর চিড়ে খাবে–'

'নাও, চাবিটা নাও, ধরো–' মাল্যবান চাবিটা গছিয়ে দিয়ে বললে ।

'শ্মশানে যাবে মশানে যাবে, সেই একদিন যাবে, যাবে তো । নাও, পথ ছাড়ো–পথ ছাড়ো দিকিন, চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে রমাদের বাসায় রঁ–অলা রাঘববোয়ালদের মত হোঁৎ করে উড়িয়ে উঠবার কোনো দরকার নেই তোমার–'

'কতা শোন । কতা?' মনটা একটু রঙে চড়ে ছিল বলে মাল্যবান 'থ'–কে 'ত' বানিয়ে দিয়ে বললে, 'রাঘববোয়াল আবার রঁ–অলা হয় না কি । কতা শোনো! কতা!' হি–হি করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল সে; যেন বীরজননীর ছেলে–দেশের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে; এ না হলে উৎপলাকে চমৎকৃত করে দেওয়া যাবে না ।

কেমন যেন একটা প্রবল ছেলেমানুষি বীরপুরুষি ঝাপটা পেয়ে বসল তাকে; চমৎকৃত করে দেবার কী দরকার, ভাবতে গেল না সে; তার চেয়ে শীতরাতে নীচের ঘরের বিছানা–কম্বল যে সত্যিই ঢের পরিচ্ছন্ন সত্য শান্ত–মূল্য–মীমাংসার পৃথিবীতে সেটা ভুলে গেল ।

মড়া পুড়িয়ে বেলা দুটোর সময়ে বাড়িতে ফিরে এলে উৎপলা বললে, 'আজকে অফিসটা বাদ দিলে তা হলে?'

'কী করব, পাড়াপড়শি যদি মরে যায়।'

'কী করলে শ্মশানে গিয়ে।'

'যাই, চৌবাচ্চায় চান করে আসি–' বলে মাল্যবান দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে পিঠে গামছা ঘষতে লাগল।

'সত্যেনবাবু গিয়েছিলেন শ্মশানে?'

'ওমা, তিনি যাবেন না!'

'ও মা, চোখ পাল্টালে যে! শুদোচ্চি। কতক্ষণ ছিলেন তিনি?

'কোন এক সময় কেটে পড়লেন, টের পেলাম না।'

'কেটে পড়লেন' কথার রকম দেখ। ওকে তো সবাই ধরাধরি করে শ্মশান থেকে নিয়ে এসেছে। খেদার হাতির মত কেমন অবলা উতল হয়ে পড়েছিলেন শুনলাম। খুব কেঁদেছেন?'

'হ্যাঁ, কেঁদেছেন বটে। দু–চার বাটি।'

'খুব লেগেছে ভদ্রলোকের,' উৎপলা বললে, 'তবু পুরুষমানুষ তো। লেজ দিয়ে ডাঁশ উড়িয়ে আবার কলাগাছ খেতে শুরু করবে; এই তো হয়ে এল বলে। বনের হাতি পোষা হাতি হবে এবার, দোজবরে সত্যেনের বৌয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে কলার পাত পড়ল বলে।'

'এ বৌ তোমার বাপের বাড়ির দেশের বুঝি? নিত–কনে হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবার শখ?' মাল্যবান শরীরটাকে, মুখটাকে (যেন তা ফোকলা হয়ে গেছে।) একটু নাচিয়ে হাসিয়ে বললে, 'সত্যেনের বিয়েতে কলার পাত দিয়ে করবে কী তুমি। হাতি হয়ে সত্যেন কলাগাছ খাবে, বলছিলে, তো তুমি; কামিনী হয়ে সেই হাতিকেই খাবে তো তুমি। বাঃ, কেমন কামিনীর মত পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে উৎপলা।'

উৎপলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আড়মোড়া ভাঙতে–ভাঙতে বললে, 'বেশ তিরিখ–তিরিখ জবাব দিচ্ছ তো তুমি, যে যাই বলুক, এই ভর–সন্ধ্যেবেলা। নাও, চান করে এসো, চা খাবে এসো।'

একটি মৃতা–খুব অল্প বয়সেই–দগ্ধ হয়েছে শ্মশানে। একটি স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনও গভীর। কিন্তু এখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব; সচ্ছল সকল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরলতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়–সময় শুধু।

রমা মারা যাওয়ার পর থেকেই মাল্যবান মাঝে–মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপন্ দেখত রাতের বেলা। একদিন সে দেখল, নিজে মরে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে সে খুব অমায়িক

ভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, সকলকে নমস্কার জানাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে বলছে; আপনাদের সঙ্গে আর তো দেখা হবে না, কোথায় যাই, কে জানে।

জেগে উঠে তার মনে হল; এ কী অদ্ভুত! হলই–বা স্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নের ভেতরেও মরে তো গিয়েছিল সে; মরে গিয়ে মানুষ আবার বসে–বসে জীবিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে কী করে! বাস্তবিক, স্বপ্ন এমন হিজিবিজি–মানুষের বুদ্ধি, বিচার, চেতনার দু–কান কেটে ছেড়ে দেয়। অনেকে বলে স্বপ্ন সত্য হয়। বাস্ত বিক, মরে যাবে কি সে? শীতের গভীর রাতে অন্ধকারকে মিশ–কালো করে দিয়ে বেশি অন্ধকারের প্রবাহের ভেতর–ভাবতে–ভাবতে গিয়ে কেমন যেন ন্যাতা জোবড়ার মত হয়ে পড়ল সে। নিজের জন্যে ততটা নয়–কিন্তু সে মরে গেলে উৎপলার উপায় হবে কী? মনু আর উৎপলার জন্যে মনটট তার নিজের চেয়ে ঢের বুড়োমানুষের মত গুঁইগাঁই করে উঠল। বিছানায় উঠে বসল; চটি পায়ে দিয়ে কম্বল জড়িয়ে আস্তে–আস্তে ওপরের ঘরে গেল সে। গিয়ে দেখল, উৎপলা ঘুমিয়ে আছে–পাশে মনু–সেও ঘুমিয়ে। বেশ শান্ত নিরাময় নিশ্বাস তাদের। ওরা অন্তত কোনো দুষ্ট স্বপ্ন দেখেনি। বেশ। এদের দিকে তাকালে আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও, এর স্বামী আর ওর বাবা যদি মরে যায়, তা হলে এ–রকম করে দুজনে ঘুমোতে পারবে কি আর? জেগেও উঠতে পারবে না আর, জাগরীতে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারবে আর সহজ সফল ভাবে।

কিন্তু, তবুও, শেষ পর্যন্ত সত্যিই মরে সে তো যায় নি, বেশ সুস্থ হয়ে বেঁচে আছে। আছে। আমাদের জীবনের নদীর নাম–অনুত্তরণ, মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, কোনোদিন এ–নদীর পথে; কিন্তু তবুও, কত লোক ব্যথা বিপদ বিফলতা মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে; উৎপলা, মনু পারবে না কেন? মানুষ হয়ে জন্মালে নানা রকম দুর্নিবার শাস্তি ভোগ করতে হয়–করতেই হয়; মনু উৎপলা বাদ যাবে না; মাল্যবান মরে গেলে মানুষের সে–পাওনা বুঝে নিতে হবে স্ত্রী–সন্তানকে; কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়; চুপ হয়ে যায় সব, শান্ত নিশ্চুপতা রয়েছে। প্রথমে মাল্যবানের মৃত্যু–তারপরে অনেকদিন পরে হয়তো তার স্ত্রী আর সন্তানের মৃত্যু; এই ত্রিমৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে সব। সময়ের কাছে মাল্যবানের দায়িত্ব ফুরিয়ে যাবে। ভাবতে–ভাবতে এখনই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল সব–এই রকম একটা অনুভব ঘিরে রাখছিল মাল্যবানকে।

কিন্তু, আরেকদিনের স্বপ্ন সব–চেয়ে ব্যথা দিল তাকে। দেখল, উৎপলা মরে গেছে। স্বপ্নের ভেতর মনে হল, উৎপলা সত্যেনবাবুর স্ত্রী–সমস্ত পৃথিবীই তা জানে–মাল্যবান নিজেও খুব ভাল করেই জানে যে, দশ–বার বছর ধরে এরা পরস্পরের বৈধ স্ত্রী–স্বামী; এদের এ রকম সম্পর্ক নিয়ে কোনো খটকার বাষ্প নেই মাল্যবানের মনে। কিন্তু তবুও, সেই সঙ্গে সেই স্বপ্নেই উৎপলা মাল্যবানের স্ত্রী–ই–আর কারু কিছু নয়; এ–রকম সব খাপছাড়া জিনিস স্বপ্নের ভেতরে খুব সত্য স্বাভাবিক বোধ হচ্ছিল। দেখা গেল, উৎপলা মরে

কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে–সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে–মাথায় সিঁদুর ধ্যাবড়া পরনে–আশ্চর্য!–বিধবার থান। মড়ার খাটিয়ার ওপর শুয়ে মরা নারী মনের, মাংসপেশীর নানা রকম নম্র, উদ্দাম আক্ষেপে নিজের মৃত্যুর বেদনা সত্যেনকে জানাচ্ছে, কিন্তু শূন্যতা ও হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানকে মর্মস্নায়ুতে।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

তখন শেষ রাত।

কম্বলের নীচে সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে মাল্যবানের। সে তাড়াতাড়ি উঠে খালি পায়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল, মনু বিছনায় উঠে বসে আছে–উৎপলা নেই। নেই, থাকবে না, বলে দিয়েছে তো স্বপ্ন। তার সঙ্গে গাঁথা এই নাস্তিত্বটা বুঝি। নেই।

‘তোর মা কোথায়, মনু?’

‘বাথরুমে গেছে।’

আছে তা হলে; কিংবা হয়তো নেই, কী মানে আছ এত বেশি শীতে শূন্যতায় প্রসন্ন রাতে দূর বাথরুমের অন্ধকারে মনুষের অস্তিত্বের, মনুর মুখের ‘বাথরুমে গেছে’ নির্দেশের।

‘কখন গেল?’

‘এই তো, এখুনি।’

‘এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোনো অসুখটসুখ করে নি তো?’

‘কার? মার?’ মনু মাথা নেড়ে বললে, ‘না তো।’

‘কোনো অসুবিধে হয়েছিল? কাঁদাকাটি করেছিল?’

চোখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিয়ে মনু বললে, ‘না তো। আমি দেখেছি, কাঁদে নি। কে বললে মাকে–তুমি বলেছে কাঁদতে?’

‘না রে।’ মাল্যবান দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, চেয়ারে বসল এবার।

মাল্যবান সদ্য স্বপ্নছুট বিতর্কাসক্ত মনকে বলছিল, সত্যেনবাবুর কাছে খিঁচে–দুমড়ে দীনতায় দাবনা কাঁপিয়ে সে কী আক্ষেপ, কান্না–নিজে মরে গেছে বলে! বাস্তবিক, স্বপ্ন বড্ড ফিচেল–নিরেট জিনিস; খ্যাঁট মেরে বদহজম হলে ও–সব বিলকি–ছিলকি স্বপ্ন দেখা যায়, এই যারা ভাবে, তারা কি কিছু জানে? স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস–এর আর কিছু নেই; ছোট অন্ধকার আর বড় অন্ধকারের টানা–পোড়েনে রাতের আলোয় অন্তিম ঘনিয়ে উঠলে স্বপ্ন দেখা যায়–দুঃস্বপ্ন, ভাল স্বপ্নও আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন সব–

'এখন কটা, বাবা? ভোর হয়ে গেছে না?'

'না। ঘুমুবে না কি? ঘুমোও, ঘুমোও।'

'ময়লার গাড়িগুলো ঘিনঘিন করছে; ওগুলো ময়লার গাড়ি না? কাক ডাকছে তো। এখন কটা রাত, বাবা?'

'কটা রাত? বলছি তোমাকে।' মাল্যবান বললে। কিন্তু ধারাপত প্রথম ভাগ নিয়ে মন তার বসে পড়তে চাচ্ছিল না। অমেয় অব্যয় স্বপ্নকূট–ও জ্ঞাননির্জ্ঞানগ্রন্থি নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে ছিল তার মন–বৃহত্তর উৎপলা গ্রন্থি পরিধির ভেতর। সব রকম গ্রন্থিকে অতিক্রম করে একটা স্বাভাবিকতার মহত্ত্বে পৌঁছুবার জন্যে।

উৎপলা বাথরুমে থেকে ফিরে এসে বললে, 'তুমি এখানে বসে যে–'

'তুমি এখন ঘুমুবে?'

'মতলবটা কী তোমার?'

'না, কিছু না। মনে হল, কোনো অসুখটসুখ করল না কি?'

'কার? আমার?'

'সারারাত বেশ ঘুম হল?'

মাল্যবানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে উৎপলা বললে, 'এখানে এখন কীসের জন্যে?'

'এমনিই এসেছিলাম। রাতে অনেকক্ষণ বইটই পড় বুঝি?'

'অনেক কাজ করি–'

'তুমি মনে করো, আমি বুঝি তোমার কাজের ফর্দ চাইতে এসেছি। না, তা নয়, এমনি কথাবার্তা বলতে এলুম।'

'এখন আমার সময় নেই,' উৎপলা বললে, 'ভাল মানুষের মত নীচে গিয়ে ঘুমোও তো।'

'তুমি এখন আর–এক দমক ঘুমিয়ে নেবে বুঝি?'

'আমার আজ উঠতে দেরি হবে। নিজে চা করে নিও।'

'নেব। দোকানেও খেয়ে আসতে পারি। আজ রাতে তোমার ঘুম হয়েছিল ভাল? আমি কেমন বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম সারাটা রাত।'

উৎপলা লেপের ভেতর চলে গিয়েছিল; শেষ রাতে আর–একটা ঘুম জড়িমার আশ্চর্য ঢেউ এসে পড়েছিল ঠিক বাথরুমে যাবার আগে; এখনও আবেশটা কেটে যায় নি; কিন্তু নীচের থেকে মানুষটা ঠিক এই সময়েই উঠে এল বাদ সাধবার জন্যে।

'তুমি যাও।'

'আজকে রাতে স্বপ্ন দেখেছিলুম, তুমি মরে গেছ ।'

'তুমি নীচে যাবে?'

'নীচে আমি যাব বটে,' মাল্যবান কম্বলটা আঁটি করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, নীচে যেতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিরি সব স্বপ্ন দেখছিলুম সারারাত। পোষ মাসের রাত; পোষলা বলে পাড়াগাঁয়–ধুম পড়ে গেছে সব। পোষলার গাঁজলা বলেন স্বপ্নকে ফ্রয়েড। কিন্তু কী জানেন স্বপ্নে ফ্রয়েড? হ্বিয়েনার যত মৃগী রুগী আসত তো তাঁর কাছে; তাদের কফিসেদ্ধর গরম–গরম সুরুয়া বানিয়ে তো আর মানবজীবনের তত্ত্ব বেরয় না।'

মনু বললে, 'মা মরে গেছে, এই স্বপ্ন দেখেছিলে রাত্রে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোর বাবা উল্টোগাধায় চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে–বাজেশিবপুরের ব্রহ্মমোহনবাবুকে দেবে। চলেছে–চলেছে–চলার আর শেষ নেই–উল্টোগাধায় চড়ে চলেছে কোথায়? বাজেশিবপুরে নকড়ি খোসাল বটব্যালের কাছে–'

মনু ফিক ফিক করে হেসে উঠল, বললে, 'ভোম্বা! বাজেশিবপুর–বা–জে–শি–ব ন–কড়ি খো–সা–ল–'

অন্ধকারের ভেতর একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে মাল্যবান ঠোঁট ভেঙে হাসছিল। বেশ ভাল লাগছিল তার; চারদিকে অন্ধকার–হয় তো একটু পাতলা হয়ে এসেছে; তবুও বেশ ভাল, নিশ্চুপ, উচ্ছিষ্ট অন্ধকারে ভরে আছে ঘরটা; খুব শীত; গায়ে গরম পট্টুর ওপর বেশ চৌখুপ্পি কম্বল জড়িয়ে বসেছে সে শীতের ভেতর। ডিমপাড়া নীড়ের দুটো কোলঘেঁষা পাখির মতন উষ্ণ হয়ে রয়েছে যেন তার একা মানুষের শরীর। বাইরে জীবনের সাড়া, চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে–তবুও মুখের নিস্তব্ধ অমরতাও অনেকখানি। ঘরের ভেতর লেপ মুড়ি দিয়ে ভারি আরামেই শুয়ে আছে উৎপলা আর মনু; মরে নি পলা, মনু বেশ ভালই আছে; উল্টোগাধার পিঠে চড়ে বাজেশিবপুরে যাওয়ার কথাটা পলা যা বলেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে–এই–ই তো বোঝা যাচ্ছে যে, স্থির ঠাণ্ডা তার মাথা। যাক, ভাল আছে ওরা। রাত পোহাতে বাকি আছে খানিকটা সময়। ঘুমোক। মাল্যবান উঠবে, ভাবছিল। বিড়িটাও ফুরিয়ে এল। নীচে গিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে বসবে এবার।

পর দিন সন্ধ্যের সময় অফিস থেকে ফিরে চা–জলখাবার খেয়ে মাল্যবান ওপরে এল।

'সেদিন সেই পরটাগুলো কাকে দিয়েছিলে?'

'কোন দিন?'

'ঐ যেদিন বৌঠানের জন্যে বেনারসি কিনতে গেলাম?'

'ওঃ, লোনার মাকে।'

'লোনার মা এসেছিল আর?

'না।'

'তার ছেলের কী হয়েছে যেন?'

'কুষ্ঠ ।'

উৎপলা বললে, 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কুষ্ঠরুগী–তাই ভাবছি–'

'লোনার মাকে আমি বলেছিলমা রোজ এসে ভাত ডাল মাছ নিয়ে যেতে ।'

'তা বলেছে, ভালই করেছে, উনুনের আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে তবে এ–সব মানুষকে হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ করতে হয় । বড় সন্তাপ এদের–'

'কই, এল না তো আর ।'

'কুষ্ঠরুগী কী না, কী হয়েছে–'

'না, বুড়ির কোনো রোগ হয়নি,' উৎপলা বললে ।

'আমি বলছি, ছেলের কথা–'

'তা অবিশ্যি, হয়ত কোনো আশ্রমে গেছে ।'

'তা হতে পারে ।'

বেশি নয়–একটু–আলোড়িত হয়ে উঠেছে বলে মনে হাচ্ছিল মাল্যবান । ঘন–ঘন কয়েকবার চোখের পলক ফেলে বললে, 'আমাকে সেদিন উপোসি রেখে লোনার মাকে পরটা তো দিয়েছ–'

'চেয়েছিল, কেন দেব না?'

'দিয়েছ, ঠিক করেছ । ভালই করেছ । ভালই করেছ–'

মাল্যবান আর কথা বাড়াবে না, ভাবছিল । সেদিনকার সেই পরটার কথা বলবার জন্যেও প্রধানত আসে নি সে; অন্য সব বিশেষ অন্তরঙ্গ কথা বলার তাগিদ; কিন্তু তবুও বললে, 'ওকে দিয়েছ, ভালই করেছ, কিন্তু আমাকেও কিছু দিলে পারতে, সমস্ত দিন অফিস খেটে আসি–'

কবেকার পরটার কথা কপচাতে এসেছে মাল্যবান, উৎপলার গলায় ঝাঁঝ এল, বললে, 'তুমি বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নিলেই পারতে–'

ভবিষ্যতে আনাতেই হবে । না হলে আমি ঠকব । কিন্তু তোমাকে বলছিলাম–'

'আমার শুনে দরকার নেই ।'

মাল্যবান একটু কঠিন হয়ে বললে, 'কেন, তোমার মাথার দুদিকে দুটো তো কান ।'

কঠিনতর হয়ে মাল্যবানের স্ত্রী বললে, 'আমার কান সকলের যা–তা কথা শোনবার জন্যে নয় ।'

মাল্যবানের মনে হল, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে–বলতে সে ভুল পথে চলেছে। সে হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললে, 'যা বলতে চই, তা বলা হয় না। অন্য পাঁচ রকম বলে ফেলি। নিজেকে ঠিকভাবে প্রকাশের শক্তি আমার নেই। তুমি কিছু মনে করো না।' উৎপলা একটা চিরুনি তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল–চুল বাঁধবে বলে নয়–এমনিই। চুল আঁচড়াতে–আঁচড়াতে সে চুপ করে রইল।

'সেদিনের মত ঘরোয়া আলাপ শেষ হয়ে গেল। নীচে চলে গেল মাল্যবান। কিন্তু সেদিনকার বিকেলের পরটা–জলখাবারের কথা নিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতে সে চায় নি তো; অভিপ্রায় ছিল তার সূক্ষ্ম গভীরতর অনেক কিছুর কিনারা ঘেঁষে কথা বলার।

কথা শেষ হলে স্বাদ। অন্য সফলতা।

কিন্তু হল না কিছুই।

মাল্যবান প্রাণধারণের ব্যাপারে কেমন যেন খারিজ হয়ে নীচে নেমে গেল। কিছুই ভাল লাগছিল না তার।

স্ত্রীর গরজের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ–মাল্যবান নিজের ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, বাস্তবিক, বাড়ির গিন্নির স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাবের জন্যেই এই ঘরটা একেবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে–ওপরের ঘরে পরিপাটির পাশে এ–ঘরটা কেমন থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

মনটা আর সেকেন্ডখানেকের জন্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল, কেন, সে এমন ঘরে পড়ে থাকবে? সমস্ত ঘরগুলোর ভাড়াই কি সে দেয় না? সমস্ত সংসারটাই তো তার টাকায় চলছে। কিন্তু তবুও–

সে ঘর গোছাতে মন দিল।

কেরোসিন কাঠের টেবিলগুলো বাইরে বার করে দিল, আলমারিটা ঝেড়ে–মুছে পরিষ্কার করল, ঝাড়ু মেরে চারদিকের ঝুল ঝেড়ে নিল, মাকড়শার জাল সাফ করল, অনেক আরশোলা ঝেঁটিয়ে বার করলে, (ফ্লিট, ডি–ডি–টি হাতের কাছে ছিল কিছুই), পায়ে পিষে মেরে ফেলল, ধোপার জন্যে অপেক্ষা না করে কাপড়ের ডাঁই সে নিজে কাচবে ঠিক করে ফেলল, জারুল কাঠের ছোট্ট টেবিলটার ওপর পরিষ্কার খবরের কাগজ পাতল, ভাবল, বিকেলে একটা কালো জমকালো টেবিলক্লথ কিনে আনবে, একটা ফুলদানি আনবে, কতকগুলো ফুল, দেয়ালে টাঙানোর জন্যে, একটি–কি দুটি, ছিমছাম ছবি।

তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে অফিসে গেল পরদিন। সকাল বেলা। অফিস থেকে ফিরে আসবার সময়ে দরকারি জিনিসগুলো কিনে আনল; টেবিলের কাপড়, ফুলদানি–

ঘরটাকে ঘণ্টা দুই ধরে সাজাল সে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, রাত বেশ অন্ধকার। এই শীতের ভেতর চান করার চৌবাচ্চাটা এখন কেউ ব্যবহার করতে আসে না। ওখানে গা–ঢাকা দিয়ে যদি সে কাপড় কাচতে

বসে, তাহলে বড় একটা কেউ টের পাবে না। রাত দশটা পর্যন্ত প্রায় কাপড় কাচা হল। উৎপলার ঘরে হিমাংশু, শ্রীরঙ্গ ইত্যাদি কয়েক জন এসেছিল; বেহালার গৎ বাজছিল; উৎপলা নিজে গান শোনাচ্ছে–আরো শোনাবে–বেহালা আরো বাজবে–ওরা (কোরাসে) গাইবে; মাল্যবানের কাছে এ একটা নিস্তারের মত মনে হল; গান–বাজনা যত রাত অব্দি চলে, ততই তার লাভ–কাপড়গুলো কেচে, খবার আগে, সে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে। কেচে, নিংড়ে, কাপড়গুলো সে গোটা দুই বালতি ঠেসে রেখে দিয়ে, চান সেরে, টেরি কেটে, বিছানায় এসে শুল। একটা চুরুট দাঁতে আটকে নিয়ে সুশৃঙ্খল সংযমী জীবনের শান্তি ধীরে–ধীরে উপভোগ করছিল। কিন্তু একটা চুরুট–দুটো চুরুট ফুরল–অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তবুও খাবারের ডাক পড়ল না। আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাল্যবান ধড়মড় করে উঠে পড়ল তারপর, বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, উঠে বসল তারপর, ঠাকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, ‘কই, এখনও গান চলছে যে–’

‘গান আমাদের বাড়িতে নয়।’

‘তবে?

‘পাশের বাড়িতে কোথাও–’

মাল্যবান একটু কান পেতে শুনে বললে, ‘ও, তাই তো, এ যে কলের গান।’

ওপরের ঘর নিথর পাথরের মত চুপ হয়ে আছে বটে। মাল্যবান সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাচ্ছিল।

ঠাকুর বলল, ‘দিদিমণি আর মা ঘুমিয়েছেন।’

‘তাই নাকি? তুমি তো আজ অনেক রাত অব্দি আছ, ঠাকুর। ব্যাপর কী? ওরা খেল না?’

‘খেয়েছেন।’

‘কখন?’

‘দুটো বাবুর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন–’

মাল্যবান একটু চুপ করে বললে, ‘আমার ভাত আছে তো?’

‘তা আছে। আপনাকে এখানে এনে দিই?’

‘বেশি কিছু দিও না। কেমন গা বমি–বমি করছে–’

অল্প কয়েক গ্রাস খেয়ে সে উঠল। ঝি এঁটো নিকিয়ে থালা বের করে চলে গেল। ঝি, ঠাকুর বাড়ি চলে গেল।

মাল্যবানের কেমন উল্টো বমি এসেছিল। সে দরজা বন্ধ করে কতকগুলো কাগজ পেতে অনেকক্ষণ ধরে হড়হড় করে বমি কলল, অনেক বমি।

মাকে মনে পড়ছিল শুধু তার। অবাক হয়ে ভাবছিল; এই ঘরেই আছেন তিনি–এই অন্ধকারের ভেতরই দাঁড়িয়ে আছেন বোধ করি; হয়ত আমার বিছানার পাশে এসে বসেছেন; গায়ে, বুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; দিচ্ছেন হয়ত–

মাল্যবানের মনে হল : উৎপলাও তো মনুর মা–মা তো সে; মাল্যবানের মায়ের মতন বড়ও হয়ে উঠবে একদিন। নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেমন পুকুরে সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপে-র ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে। তার নিজের মা–যে নেই আজ, দশ–বার বছর আগে নিমতলা ঘাটে যাকে ছাই হয়ে যেতে দেখেছিল মাল্যবান–মাল্যবানের মায়ের অব্যক্ত ইঙ্গিতের মৃত্যু হয়নি তো তবু–ধারণ বহন করবার জন্যে অপর নারী এসেছে এই ঘরে; মা হয়েছে মনুর মা। মাল্যবান আজ মনুর মার স্বামী ঠিক নয়; মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা–এই দুটি নারীকে একজনের মতন–মায়ের মতন–তার ঘরের ভেতর খুঁজে পাবার জন্যে কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল; আসুক নিজের মায়ের মূর্তিতে, কিংবা আসুক উৎপলার বেশে–দুজনের ভেতরেই দুজনকে খুঁজে পাবে সে–পাবে একজন মাকে–মাতৃত্ব; যা এখন মাল্যবান পাবে তার কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে। মাল্যবান কয়েকবার ডাক ছেড়ে অস্পষ্ট ভাবে ডাকল–মাকে, ঠাকুরকে, ঝিকে–মনুর মাকে, না, উৎপলাকে, ঠিক বোঝা গেল না।

আস্তে আস্তে কমে গেল–থেমে গেল বমির চাড় মাল্যবানের।

মাল্যবান একটু ভড়কে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, উৎপলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর বাড়ি চলে যাবার সময়ে আমাকে বলল, তুমি বমি করছ। বমি হল কেন?'

'কী জানি।'

'কী খেয়েছিলে?'

'কিচ্ছু না, শুধু ভাত।'

'বাজারের খাবারটাবার?'

'না তো'

উৎপলা বললে, 'আর বমি হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'না, বোধ হয়।'

'পেটে ব্যাথা আছে?'

'না, সে–সব কিছু নেই।'

'আচ্ছা, শোও, শুয়ে পড় । আমি বাতাস করছি ।'

মাল্যবান খানিকক্ষণ বালিশে মাথা রেখে বাতাস খেয়ে বললে, 'ভাল লাগছে এখন ।'

'যে মা হয়েছে', মাল্যবান বললে, 'সে মানুষের শিয়রে না এসে পারে না । তুমি মনুর মা বটে, আমার স্ত্রী । কিন্তু সময়ের কোনো শেষ নেই তো, সেই সময়ের ভেতর আমাদের বাস; সময়ের হাত এসে এখানে এ–জিনিসটা মুছে দেয়–সেখানে সে জিনিসটা জাগিয়ে দেয়; মানুষের স্ত্রী তুমি; নিজেও তো মানুষের মা, মানুষ, সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার ভেতর তোমার মা–রূপ ফুটে উঠল তো; দেখছি । সময়ের দু–একটা ঘূর্ণিকে কেমন অবিরাম গ্রন্থির বলয়ে নিয়ে এসে গড়ে তুললে, দেখছি তো । এই তো নীচে নেমে এলে হাড়–কালিয়ে শীতের রাতে, সিঁড়ি বেয়ে । না এলেও তো পারতে । আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশাও করি নি যে, তুমি আসবে । কিন্তু তবুও তো এলে–'

উৎপলার বাঁ হাতের দু–চারটে আঙুলের দিকে ঝোঁক গেল মাল্যবানের! কিন্তু সে আঙুল কটি বিশেষ কোনো সাড়া দিল না । নিজের ভাবুকতা আন্তরিকতার আত্মনুন্যতা নিয়ে মাল্যবান এত বেশি তলিয়ে গিয়েছিল যে, স্ত্রীর আঙুল কটির রহস্য ছাঁকবার জন্যে কোনো তাড়া ছিল না তার । রহস্যকে কঠিন আলোর মত পরিষ্কার করে বুঝে দেখবার শক্তি ও সময় পুরুষ তাকে দেয় নি; অনেক বিষয়েই বেচারি অন্ধ অবোধ বলে পোড়ো ঘরের চামচিকের মত হর্ষকম্পান্বিত । কিন্তু মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও; সে–জিনিসটা খুব–নিয়ন্ত্রতি নয় যদিও । কাজেই চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে । পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে খুব সম্ভব মাল্যবানের । বিজ্ঞানে যাকে বলে চতুর্থ–বিস্তার, সেই চাতুর্যের দেশেও বাস করে সে । কাজেই মা ও মাতৃত্বের ঐ দিব্য কেন্দ্র তার নজরে পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু ও–সব শিখরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সে, শিগগিরই ধসে ভেঙে পড়ে গেল সে তার ছোট সংস্কারের ছোট সংসারে–স্বামী–স্ত্রী কামনা লিপ্সা হতাশার ঘূর্ণিফেনার ভেতর ।

উৎপলার হাতপাখা আবেগে নড়ে নি কখনো; সবেগে নড়ছিল কিছুক্ষণ আগে । এখন ক্রমে–ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছিল ।

'মাঝে–মাঝে আমার মনে হয়, একা থাকলে বেশ হও । কেউ–কেউ একা থাকে বটে, যেমন আমাদের হেডমাস্টারমশাই চিরটা কাল কাটিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ বয়েসে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল । মেয়েদের দর্শন দিতেন বটে, কিন্তু সাধুপুরুষ, স্ত্রীলোকের দর্শন পাবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন । লালসা জন্মাল । মেয়েরা ভাল মনে করে সেবা করবার জন্যে হেডমস্টারমশাইর হাত–পা টিপে দিত রোজ, উনিও ক্রমে–ক্রমে গোপনে সুবিধে পেয়ে তাদের গাল টিপতে আরম্ভ করে দিলেন । গড়াল কেলেঙ্কারি অনেক

দূর। বিয়ে হল না তবু ছেলে হল, মেয়ে হল। তবুও সিদ্ধপুরুষ রইলেন। হেডমাস্টারমশাইর চিতের ওপর ও–অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মঠ। নৌকোর ছইয়ের ওপর বসে কত মাইল দূরের থেকে মঠ দেখা যায়?.....'

মাল্যবান কথা বলে যাচ্ছিল গভীর বৃষ্টির রাত কিছুক্ষণের জন্যে বীতবর্ষণ হয়ে পাড়াগাঁর নালায়, পুকুরে, খালে, কলকল শব্দে চলে যেতে যেতে নিজের সাথে নিজে যেমন কথা বলে চলে, জল।

বাতাস করতে–করতে উৎপলার হাতে ব্যথা হয়ে উঠল, কিন্তু মাল্যবানের দিক থেকে কোনো নিষেধ নেই। বেশি কথা বলে মাল্যবান বেশি ফেনিয়ে ওঠে, মাঝে–মাঝে গ্যাঁজায়, নিজেকে নিয়ে নিজেকে উপভোগ করবার দুর্ভোগ ভোগাবার বেশ ক্ষমতা আছে; ধ্বেৎ, ভাল লাগে না আমার; এক–এক সময় অবিশ্যি আমাকেও অবশ করে ফেলে–যেমন মনু হবার আগে। কিন্তু ভাল লাগে না আর আজকাল, ধ্বুৎ।

পাখাটা বিছানার পাশে রেখে দিয়ে উৎপলা বললে, 'বমি তো করলে, কিন্তু এখন ওষুধের ব্যবস্থা কী করা হবে?'

'সে জন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই, পলা।'

'ওষুধ আছে?'

'না।'

'তবে?'

'ওষুধ আমার লাগবে না। কেমন পেটে মোচড় খেল, বমি হয়ে গেল, ব্যস। সে–রকম বেশি কিছু হলে শরীরের আক্ষেপটা এত তাড়াতাড়ি পড়ে যেত না।'

'বলা যায় না কিছু। ওষুধ নেই। ডাক্তারের ব্যবস্থাই–বা কে করবে?'

'না, না, অসুখ নয় তো, একটু হয়রানি হয়েছিল,' মাল্যবান একটু আলোড়িত হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে শেষমেশ শুয়ে থাকতে–থাকতেই বললে, 'সেরে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে–বলতেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'এ বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ নেই,' টক বিরস মুখে উৎপলা বললে, 'অসুখ–বিসুখের সময়ে নানা রকম অসুবিধে। ডাক্তার ডাকে কে–রাত জাগে কে।'

মাল্যবান স্ত্রীর মুখের খিঁচুনিটাকে ইস্ত্রি করে পালিশ করে দেবার জন্যে খুব স্নিগ্ধ ভাবে বললে, 'এবার একজন সরকারের মত রাখব ভাবছি; ফাইফরমাস–সবই চলবে।'

'কিন্তু, আজকের রাতে কে জাগে–'

'বসো, তুমি খানিকটা সময় বসে যাও; নিজের থেকেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

উৎপলা হাত গটিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

কেটে গেল খানিকটা সময়। কেউ কোনো কথা বলছে না। কারো কোন কাজ করতে হবে মনে হচ্ছে। ভাল লাগছে না কারোরই। কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সময় কেটে গেল আরও।

‘চুপচাপ যে?’

‘কী করতে হবে?’

‘বাতাস করছিলে তো–’

উৎপলা উঠে দাঁড়াল। বাতি জ্বালিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, ‘এ বালতি দুটো ভিজে কাপড়ে ঠেসে রেখেছে কে?’

একটা বালতি তুলে সমস্ত কাপড় মেঝের ওপর ঢেলে ফেলে দিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে গেল।

‘ওগুলো–কাচা কাপড় ছিল, মাটিতে ফেলে দিলে–’ মাল্যবান তাকিয়ে দেখল নোংরা কাদায় মাটিতে গড়াচ্ছে কাপড়গুলো, পায়ে মাড়িয়ে–মাড়িয়ে উৎপলা চলে গেছে। চৌবাচ্চার থেকে এক বালতি জল এসে হিসসো করে ছড়িয়ে দিল উৎপলা; আরো এক বালতি ঢেলে ছড়িয়ে মরিয়া হয়ে তাকিয়ে দেখল, বমি সাফ করতে আরো অন্তত দু–বালতি জলের দরকার। উৎপলার লোকায়ত মন, আর যা লোকায়ত নয়, অথচ গভীরতার যা–লোকায়তকে চালাচ্ছে–এই শীতের দুপুর–রাতে হাত–পায়ের চেয়েও ঢের বেশি টনটন করে উঠল সে সব জিনিস।

শেষ বালতি জল এনে ঘরের ভেতর ঢেলে দিল উৎপলা; তারপরে মাল্যবানের একটা সাবানে কাচা ভিজে ধুতি নিয়ে জায়গাটা নিকোতে লগল।

‘কেন তুমি নিকোচ্ছ তোমার নিজের হাতে, আহা, থাক না!’ মল্যবান বললে। আনাড়ি ছেলে হাতে কলাপাতার বাঁশির মত কেমন কাহিল ভাবে কেঁপে–কেঁপে চিরে গিয়ে বেজে উঠে মাল্যবান আবার বললে, ‘ঠিক হল না, ঠিক হল না, আমার ধুতিটা তুমি রেখে দাও–আমি নোংরা মুছবার জন্যে তোমাকে জিনিস দিচ্ছি।’

কালাপাতার বাঁশি কেঁপে ফেঁড়ে গিয়ে বললে, ‘বাঃ, উৎপলা, আমার ধুতিটা লোপাট করলে–এই তো আজ সন্ধ্যেবেলা খিদিরপুরের সাবান দিয়ে কেচেছি।’

উৎপলা ঘার গুঁজে মেঝে পরিষ্কার করতে–করতে ঘরের কোণের একটা ড্রেনের দিকে সমস্ত বের করে দিচ্ছিল– হাত দিয়ে নয়, মাল্যবানের ধুতিটা পায়ে খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে পা চালিয়ে কাজ করছিল সে; কাজ করে যেতে লাগল, কোনো জবাব দিল না। এ–রকম সব কাজ তার করবার কথা নয়, শীতের রাতে তো নয়ই; কিছুতেই করত না সে এ–কাজ। কিন্তু কেমন যেন ভূতে তাড়িয়ে এনেছে তাকে। তাই নীচে নেমে এসেছে সে এমন একটা বিশ্রী ছোঁয়াছানার কাজ করছে–হোক না পায়ে দিয়ে–স্বাভাবিক অবস্থায় যা

মেরে পিটিয়েও কেউ করাতে পারত না তাকে দিয়ে। ভূতেই পেয়েছে তাকে, চিমড়ে ভূতে পেয়েছে; স্তম্ভিত হয়ে পা ডলছিল আর ভাবছিল উৎপলা।

উৎপলার (মন্থদণ্ডের মত) পায়ে জড়ান ধুতিটার কাদা বমি লোকসানির দিকে তাকিয়ে মাল্যবান কী যেন কেমন যেন হয়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'করিম ভাই মিলের সুন্দর ধুতিটা–এই দিন পনের আগে কিনেছি–তার তুমি এই অবস্থা করলে–এ তো পরাও যাবে না আর।'

কিন্তু ধুতি আরও একটা লাগল উৎপলার–সেটা ক্যালিকো মিলের। মাল্যবানের ভেতরের শাঁসটাই মোচড় দিয়ে উঠল। একমাসের মাইনের চেয়ে যে–সব লোকের একটা ধুতি বা চাদরকে এক–এক সময়ে ঢের বেশি দামি, দরকারি মনে হয়, মাল্যবান সেই ধরনের মানুষ। কাজেই, অনেক কুণ্ঠা, আক্ষেপ, কাতরতার পরিচয় দিল সে, অনেক ছোট ছেঁদো কথা বললে; কিন্তু সব সময়েই গলা তার হেমন্তের দুপুরে একটা নিঃসঙ্গ উড়চুঙোর মত মিনমিন ফিরফির ঝিনমিন করছিল, কাতর করুণ, ঝাঁঝ নেই, উষ্মা নেই।

উৎপলার হাসি পাচ্ছিল–মাঝে–মাঝে দয়া হচ্ছিল তার লোকটার জন্যে, মানুষটাকে খানিকটা নিষ্পেষিত করবার জন্যই আর ভাল–ভাল দুটো ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা সে নিকিয়েছে–এ–কথা মনে করে নির্যাতন করবার শখ এখন তার খনিকটা কমে গেল যেন–কাপড় দুটো লাথিয়ে–লাথিয়ে ঘর থেকে বার করে দিল উৎপলা।

'যা হবার হয়ে গেছে,' মাল্যবান মনে খুব বল, খুব সৎ সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বললে, 'এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করতে যেও না।' যেন কঠিন যত্নে নিয়ন্ত্রিত জীবনের দীনতা ও আত্মশুদ্ধির গহ্বর থেকে (মনে হচ্ছিল উৎপলার) মাল্যবান কথা বলছে।

কুলুঙ্গির থেকে সাবান নিয়ে উৎপলা হাত কচলাচ্ছিল–হাত পা ঘাড় মুখ ধুয়ে আসবে সে।

'কোথায় সরালে কাপড় দুটো? চুরি যাবে না তো?'

'এ–দিককার দরজা তো বন্ধ; তবে পাশের বাড়ির ঝি–চাক ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা–নামা করে সারা–রাত। দেখতে পেলে ওরা নিয়ে যাবে হয়তো।'

'নিয়ে যাবে? ঘরের ভেতর রেখে দেবে না তুমি ধুতিগুলো?'

কোনো কথা না বলে চৌবাচ্চার থেকে হাত–পা ঘাড়–মুখ খুব ভাল করে ধুয়ে এল উৎপলা। মাল্যবানের বাক্সের থেকে একটা ধোপাবাড়ির ফেরত তোয়ালে বের করে উৎপলা বেশ তোয়াজ করে রগড়ে–রগড়ে হাত–পা মুখ–পিঠ মুছে ফেলতে লাগল। তার পর স্লিপার পায়ে গলিয়ে ওপরে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

'আমার বিছানার পাশে এসে বসো–না।'

'না, আমি আর বসব না।' এ কি, এ যে তোমার স্লিপার পায়ে দিয়েছি।

আমার জুতো কোথায় গেল? ইশ, মশা কামড়াচ্ছে! যাক, চলি–' উৎপলা বললে।

'আচ্ছা, এসো–ঘুমোও গিয়ে।'

শেষ রাতের একটা বসন্তবউড়ি পাখির মত একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে, একটু চলকে উঠে, হেসে, জেগে উঠবার, বেঁচে থাকবার ইচ্ছা–অনিচ্ছা অতিক্রম করে (মাল্যবানের মনে হল) কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল। সে কি উৎপলা? একটা চুরুট জ্বলিয়ে মাল্যবান নিজেকে বললে, না, সে উৎপলা নয়; উৎপলাতে মাল্যবান যে–জিনিস আরোপ করেছে, সেই অশরীরী আত্মাটা–নেই; ছিল না; এই মুহূর্তেই সরে গেল তবু; ওপরের দিকে, ওপরের ঘরে যাবার অছিলায় আরো ওপরে, বড় বাতাসে, শীতরাতের ঘুরনো সিঁড়ির শীর্ষে, নক্ষত্রে মিশে গেল কোথায়।

পরদিন রাতে ওপরের ঘরে মাল্যবান বলেছিল উৎপলাকে, 'তোমার এই খাটটা ঢের বড়।'

'হ্যাঁ, বাবা দিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ের সময়ে। বরপক্ষকে ঠকাবার মতলব ছিল না তো তাঁর।'

'আমি তা বলছি না।'

উৎপলা ধোপদুরস্ত বিছানার চাদরটা পাট–পাট করে পাতছিল–কোন কথা না বলে হাতের কাজ করে যেতে লাগল।

'আমি ভাবছিলাম, দুজন বাড়ন্ত লোক এ–খাটে বেশ এঁটে যায়।'

'তা যায়, তাতে কী?'

'আজ রাতে এ–খাটে আমি শুলেও তো পারি; পারি না?'

'তা হলে আমাকে নীচের ঘরের খাটে যেতে হয়।'

'কেন যাবে?' মাল্যবান উৎপলাকে ভেদ করে কোনো শ্রেয়োতর আত্মার দিকে তাকিয়ে যেন বললে, 'আমার পাশে শুয়ে থাকবে।'

'যা নয়, তাই,' শান্ত দৃঢ়তায় বললে উৎপলা; কৃতী অভিভাবিকার মত ঠোঁট চেপে, দাঁত চেপে।

'তোমার মেজদা আর বৌঠান তো এ–খাটেই শোবে দুজন।'

'তা তারা শুয়ে শান্তি পায়।'

মাল্যবান একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'আমরা পাব না?'

'চাইলেই ভোগে লাগে না,' উৎপলা মনুকে নয়, মাল্যবানকেই বললে।

'তা বটে। মাল্যবান হাতে পানটা মুখে তুলবার ভরসা পেল না আর। সিগারেটটাও না খেয়ে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল–জ্বলন্ত সিগারেটটা–

বললে, 'এ–রকমই যদি হল, তা হলে ফুটপাথে গিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলেই পারি ।'

পরিপাটি বিছানা পাতা শেষ করে উৎপলা বললে, 'ফুটপাথে তুমি কোনোদিন শোবে না । তবে একদিন শুয়ে দেখলে পারো । যাও–না, আজই যাও ।'

'আমি ফুটপাথে শুলে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার মুখ ।'

'তুমি তো নিজেই বলছ, ফুটপাথে আর ভদ্রলোকের বিছানায় কোনো তফাত নেই–'

'দেখছি তো নেই । কেন নেই? কেন নই, সেটা তুমি আমাকে নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বলবে?

'বলবার যখন, তখন বলা হবে, 'উৎপলা বললে, 'কিন্তু ফুটপাতে শোয়ার কী হল?'

'যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে শুতে আমার খুব আপত্তি নেই ।'

উৎপলা মশারি টাঙিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'আপত্তি নেই, তা হলে বাধাটা কীসের?'

মাল্যবান চকমকি ঠুকে আবার একটা সিগারেট জ্বেলে নিয়ে বললে, 'যাচ্ছি আমি শুতে–'

'কোথায়? তোমার নিজের ঘরে?'

'না–'

'ফুটপাথে? যাও–' বললে উৎপলা; ঘুমের লতায়–পাতায়–তন্তুতে জড়িয়ে যেতে–যেতে কাছের থেকে দূরে চলে যেতে–যেতে যেন ।

'এসো, দেখে যাও । দেখবে না?'

'সে আমার দেখা আছে,' বসে পাশ ফিরল; ফিরে শুয়ে লেপটা ভাল করে জড়িয়ে নিতে না–নিতেই ঘুমিয়ে পড়ল উৎপলা ।

নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল; একটা নিবিড় বেড়ালের চেয়েও গভীর আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েমানুষটি–তুলোর গরম আর শীতের ঠাণ্ডা খুব প্রবল ভাবে মিশ খেলেই হল–কোনো পুরুষমানুষের স্পর্শের দরকার নেই, উৎপলার–

মাল্যবান নিচে চলে গেল ।

এক ঘুমের পর মাঝরাতের শীতে–গরমে–নিজের বিছানাটা মন্দ লাগছিল না তার । মাল্যবানের মনে হল, মানুষের মন সারাটা দিন–রাতের দিকটাও–বোকা হ্যাংলার মত চায়–অপেক্ষা করে সাধনা করে, যেন নিজের কিছু নেই তার, অন্যে এসে দেবে তাকে, তবে হবে । কিন্তু গভীর রাতে বিছানায় শরীরই তো স্বাদ । শরীরটাই তো সব দেয় মানুষকে । মন কী? মন কে? মন কিছু নয় । বেশ নিবিড় শীতের রাতে চমৎকার শরীরের স্বাদ পাচ্ছিল মাল্যবান ।

পুরুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘুচিয়েছে বটে উৎপলা; কিন্তু তাই বলে শরীরের স্বাদের সঙ্গে নয়। দোতলায় গভীর রাতে তার নিজের বিছানায় আশ্চর্য স্বাদ উপলব্ধি করছিল সে।

মাল্যবানের ঘরের জিনিসপত্র ব্যবস্থা আবার আগের মতন দাঁত খিঁচিয়ে উঠল; নোঙরা হলদে কাগজের স্তূপ চারদিকে, জানালার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত রাস্তার ধুলো, ধোঁয়া, অঝোর গোলাপায়রার বাসা, মেঝের চারদিকে চুরুটের টুকরো, থ্যাঁতলানো চুরুট, তামাকপাতা, ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, পাখির পালক বিষ্ঠা, পুরনো বাতিল লণ্ঠনের টুকরো–টাকরা, ভাঙা চিমনির কাচের রাশ; তেল, অ্যাসিড, ওষুধের নোংরা শিশি–বোতলের জাঙ্গাল, হুঁড়িকুড়ি, কলসি, বস্তু ও ঝুড়ি ও একদাগা, আট–দশ জোরা ছেঁড়া থ্যাবড়া প্যানেলা আর ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা জামা, মশারির নুড়ি–আশ্চর্য দৈববলে কোনো শব্দ হচ্ছে না, কোনো–কিছুকে নড়তেও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরের ভেতর সুটকি বুড়ি, ডাইনি বুড়ি, থুপি বুড়িদের কান্নাকাটি হামলা বলাৎকার চলছে যেন দিনরাত–মাল্যবান টের পাচ্ছিল, উপলব্ধি করছিল।

ফুলদানিটা সে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখেছিল। উৎপলা যখন এ–জিনিসটাকে পছন্দ করল না, তখন থেকেই এটার ভেতর কেমন একটা শ্রীছাঁদের বাপান্ত গরমিল বেরিয়ে পড়েছে যেন–এক রাশ হাঁড়িকুড়ির ভেতর ফুলদানিটাও কান্না ভেঙে গড়িয়ে পড়ে রইল।

এই ঘরের ভেতরেই এক দিন একটা বেড়ালের ছানা আশ্রয় নিল। রাত্রে ঘুমিয়েছিল, ঘরের ভেতর মড়াকান্না শুনে উঠতে হল, উঠে বসল। বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই এই খোলা জানালার ভেতর দিয়ে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে কেউ। মানুষ যে–জিনিস নিজে সহ্য করতে পারে না, পরের ঘাড়ে তা চাপাতে তার এত লোভ–এমন কৌশল; ভাবছিল, মাল্যবান; কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে করা যায় কী? যে–রকম ভাবে বেনো হাওয়ার মুখে হাঁ করে কাঁদছিল বাচ্চাটা, তাতে ওপরের ঘরের মানুষেরও ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

রাস্তার দিকের জানালা দিয়েই এটাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারা যায়–তারপর জানালা দিতে পারা যায় বন্ধ করে। বেড়ালের ছানাটার তারপরে কী হবে, সে–কথা ভেবে মাথা ঘামিয়ে কী দরকার। পৃথিবীতে বেড়াল–কুকুরের বাচ্চারা পথ কেটে নেয়–কিংবা যায় মরে। মৃত যে, তার তো রফা হয়ে গেল; গোলকধাঁধাটা সামনের থেকে সরে গেছে; নির্দেশ চাই না, সহানুভূতি সমাশ্রয়ের দরকার নেই আর; সব চেয়ে শান্তি; বেঁচে থাকার ব্যথা, বৈভব নেই। কিন্তু তবুও সে–রকম শান্তি বেড়াল ছানাটাকে পাইয়ে দিতে ভরসায় কুলিয়ে উঠল না মাল্যবানের।

রাত দুপুর–কোথাও কোনো দুধ নেই, খাবার নেই; বাচ্চাটাকে কিছু দেওয়ার উপায় নেই এখন; বিছানায় বসে–বসে অনেকক্ষণ এর কান্না সহ্য করতে লাগল মাল্যবান। মাল্যবান–পর্বত যেন সহ্যাদ্রি হয়ে গেল তবুও কান্না থামবে না–এমনই আনন্ত্য এর। একে–একে অনেক কথা ভেবে যাচ্ছিল মাল্যবান; ভাবছিল, এই বচ্চাটার বাপ–মার কথা, কেমন হাত–পা ঝেড়ে জীবনকে ঝাড়ছে তারা; এই বাচ্চার ঝাড়টাকে জন্ম দেবার আগে কালোকিষ্টি রাতে আর জ্যোৎস্না রাতে পরীতে পেয়েছিল সেই ধাড়ি বেড়াল দুটোকে; কী না করেছিল তারা; কিন্তু আগামী ঋতুর ছানাগুলোকে জন্ম দেওয়ার আগে আবার তারা দুর্নিবার ভাবে জোড় মেলাবে এসে, কিন্তু এখন তারা গত ঋতুর সমস্ত বিগত ঋতুর, কৃতকর্মের দায়িত্বের থেকে খালাশ। জীবনকে তারা এ–রকম করে ফাঁকি দেয়, তবুও প্রশ্রয় পায় জীবনের কাছ থেকে নব–নব ঋতুসমাগম হলেই–বারবার–বারবার। মানুষকে তো এ–রকম আচার–ব্যবহারের জন্যে ঢের গভীর শাস্তি দিত জীবন। থাক, তবুও এর বাপ–মাকে কোনো শাস্তি দিতে চায় না সে।

মাল্যবানের ভাবনার মোড় ঘুরে গেল, পরীতে পাওয়া মিথুনের কথা ভুলে গেল সে; মনে–মনে বললে, কথায়ই বলে কুকুর–বেড়ালের জীবন–বাস্তবিক, সে–সব জীবনের এমনিই ঢের কষ্ট। হয়ত দু–চার মাস বয়েস এই ছানাটির, মা নেই, ভাই–বোন কিছু নেই, জবালার ছেলের পিতৃপরিচয় নেই বলে কোনো উদ্বেগও নেই বেট– মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ভাবছিল–

কিন্তু, মড়াকান্নায় তোলপাড় হয়ে উঠছিল; চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে ভাবছিল; এমন শীতের দুর্বার রাতে কোথাকার একটা মিকড়ে হারামজাদা জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকার খুপড়ির ভেতর এটাকে সটকাল।

সে এক সময় ছিল বটে, মাল্যবান উপলব্ধি করল, যখন মানুষের শিশুর এ–রকম ব্যপার হলে এতক্ষণে কত দিক দিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যেত, কিন্তু মানুষের পৃথিবী তো আজকাল পাগলাগারদ–সেখানে মানুষের শিশু আর বেড়ালের ছানার একই অবস্থা।

মশা নেই ঘরে; ইঁদুরে কামড়াতে পারে সেই ভয়ে মশারি টানিয়ে শুয়েছিল মাল্যবান; মশারিটা তুলে বালিশে ঠেস দিয়ে চুরুট মুখে বসে রইল সে।

একটু পড়ে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল।

মানুষের নড়াচড়ার শব্দে, আলো দেখে, ভয় পেয়ে, বাচ্চাটা একটু থামল। কিন্তু মাল্যবান বিছানায় এসে বসতেই আবার সেই কান্না। মস্ত ট্রাম–বাস–লরির নটখটি ঘড়ঘড়ির চেয়ে এ–কান্না ঢের আলাদা জিনিস; এ–জিনিস সহ্য করতে হলে সৃষ্টিটাকেই বুঝি দেখতে হবে, উপনিষদের ও আইনস্টাইন হোয়াইটহেডের

ঈশ্বরের হিসেবের মিল–গরমিলটাকে; অনেক সহানুভূতি সহিষ্ণুতার দরকার। মাল্যবান কেমন অসময়ে তা হারিয়ে ফেলল।

বিছানার থেকে লাফিয়ে উঠে তেরিয়া হয়ে সে বাচ্চাটাকে তাড়া করল। এত জঞ্জাল এ ঘরের ভেতর–এমন সব অসম্ভব জায়গায় লুকোয়–এমন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে–বিছানায় ফিরে আসতে না–আসতেই আবার ভরসা পেয়ে এমন প্যানপ্যানানি শুরু করে যে, মাল্যবানের ঘেন্না ধরে গেল একেবারে।

এবার সে বাচ্চাটাকে ধরলই।

ধরে, এমন জোরে তাকে দেয়ালে আছড়ে মারল যে, দুই মুহূর্তের ভেরতই সেটা কাতরাতে কাতরাতে মরে গেল।

এর পর পাঁচ–ছদিন মাল্যবান কারোর সঙ্গে কথাও বলতে পারল না আর। স্ত্রীর কাছে, অফিসে চোর; সংসারের সমাজে পৃথিবীর ডাঙার উপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেয় যে–মনপবনের আশ্চর্য দেবতা, তার কাছে, তামাকের হুঁকোর জলের ভেতর জোঁকের মত, যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল মাল্যবানের মন।

উৎপলা যে তাকে এত উপেক্ষা করে, এটা তার ভাল লাগে; বাঘের মাসি বেড়ালকে মেরে ফেলেছে মাল্যবান, ঘরের ভেতর নারীসোনালিব্যাঘ্রের হিংস্রতায় হৃদয়হীনতায় কেমন একটা নিপট নিগূঢ় তৃপ্তি পায় সে। নীচের ঘরের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতির ভেতর স্ত্রী–পরিত্যক্ত নচ্ছার মানুষ বলে নিজেকে সে বারবার প্রতিপাদন করে দেখতে চায়, এ তার ভাল লাগে; নিজেকে অবিচারিত, অভালবাসিত, বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিয়ে নিতে–নিতে মনটা লঘু হয়ে ওঠে তার; জীবনের থেকে কুবাতাস, দুর্ভাগ্য, অবিচার, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে পথ থাকে না আর।

'তুমি কদিন থেকে মাছ খাচ্ছ না যে?'

'কেমন আঁশটে গন্ধ,' মাল্যবান বললে।

'কেন, পেঁয়াজ–মশলা দিয়ে বেশ তো রাঁধে ঠাকুর।'

'ভাল করে ভাজে না–' বলে দিল একটা কথা মাল্যবান।

'তুমি কি পুড়িয়ে খেতে চাও?'

'না, না–' মাল্যবান আঙুল ছড়িয়ে, হাত মুঠো করে, আঙুল ছড়িয়ে, হাত মুঠো করে বললে, 'বরফ–দেওয়া মাছ কি না, কেমন কাঠের মতন। খেতে ইচ্ছে করে না।'

'বরফ দেওয়া মাছ এ মোটেই নয়। বেশ তো জিনিস। টাটকা। পুকুরের। নিজে কিনে আন, অথচ নিজে বুঝতে পার না?'

মাল্যবান কোনো কথা বললে না।

'কাই মাছ খেতে পার। বেশ তো লাগে খেতে।'

কিন্তু মাল্যবান বিনে মাছেই চালাতে লাগল। কোনোদিন দই খায়; কোনো দিন খায় না; ফেলাছড়া করে খায়। বৌয়ের ন্যাওটা নয় আর। খুব কম কথা বলে। কোনো নালিশ নেই, আপত্তি নেই, মাথার চুলে তেল নেই, টেরি নেই। অন্য অনেকে হলে মাল্যবানকে চেপেই ধরত, 'খুলে বল তো,' 'হচ্ছে কী সব,' 'টেসে গেলে কেথায়,' 'সাপটে না খাবে তো জাপটে ধরব' বলে তোলপাড় করে তুলত তাকে; কিন্তু উৎপলার চোখে কিছু পড়ল না যেন; ভালই হল; মাল্যবানের রক্তের মনের শান্ত সাত্ত্বিকতা নষ্ট করবার জন্যে কেউ হাত কচলাল না। সে যা চাচ্ছিল, সেই পটনিশ্চয়তা বিনিঃশেষে দেওয়া হল তাকে; বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চায়? সাপুড়ের চুবড়িতে থাকতে চায়? থাকুক। কেউ বাধা দিতে গেল না। কোনো গোলমাল নেই।

কিন্তু একটা বেড়ালছানা খুন–মাল্যবানের মতন মানুষের জীবনেও এ-ব্যাপারটার অখাদ্য আপরাধের তীক্ষ্ণতা দিনরাতের ঘষা খেতে খেতে নষ্ট হয়ে ক্ষয় পেয়ে গেল। সে তার আগের জীবন ফিরে পেল। বেড়ল–ছানাটির কথা মাঝে-মাঝে মনে হয় বটে, কিন্তু তার নিজের জীবনের আবেদন ঢের বেশি। মাছ, মাংস, ডিম, অফিস, খবরের কাগজ, টাকাকড়ির চিন্তা, বৌয়ের এটা–ওটা–সেটা ঊনপঞ্চাশটা, বাতাস, গোলদিঘি, চুরুট–নানা রউম স্রোতের ভেতর হারিয়ে গেল সে। সাধারণ সাংসারিক মানুষ হয়ে উঠল আবার কে–একদিন খুব বেশি রাত বিছানায় জেগে থেকে–থেকে মাল্যবানের মনে হয়, কাদাপাঁকের ভেতরে একটা শুয়োরের মত সমস্ত দিন জীবনটা যেন তার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেড়ায়; বেড়ালের ছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল; স্ত্রীর মমতাবিমুখতার ঢের ওপরে চলে গিয়েছিল সে, অফিসের কাজে যে–কোনো মুহূর্তে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার মত একটা সহজ স্বাধীনতা এসেছিল মনের ভেতর, রক্তমাংসের শরীরে পাখির মত লঘুতা এসেছিল যেন তার, যেন সে অনেক ওপরে উড়ে চলে যেতে পারে, জীবনের উপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা লোভ কিছুই যেন নাগাল পায় না তাকে আর; চোত–বোশেখের পাড়াগাঁর দুপুরে বিকেলের অনির্বচনীয়তার ভেতর প্যাট–প্যাট করে ফাঁড়া ওড়া শিমুলের তুলোর মত আশ্চর্য ধীরমুক্তির স্বাদ পেয়েছিল সে নীলিমা–নীলিমায়, সূর্যে, রৌদ্রে, আকাশপথের পাখির পালকের, মৌমাছির পাখনায়, তারপরে কোন নীলিমা নিঃঝুম পরলোকের দেশে। কিন্তু দিনের বেলা এ–সব কথা মনে থাকে না বড় একটা তার; মনে পড়লেও দাগ বসাতে পারে না তেমন।

এই–ই হওয়া উচিত। মাল্যবানের মতন মানুষের পক্ষে সমস্তটা দিন অফিস বা সংসারের অন্য যে কোন মানুষের মত জীবন কাটানোই স্বাভাবিক। রাতের বেলাটাও তার তাদের মতই কেটে যেত, যদি উৎপলার মত একজন 'সত্তমা' স্ত্রী এসে বাধ না সাধত। উৎপলার সম্পর্কে এসে জীবন ধাক্কা, আঘাত,

উপলব্ধির ভেতর দিয়ে চলেছে। এ না–হলে সে তার অফিসের মাইতি–দে–গড়াগড়ি–গুঁইবাবুদের মত এড়িগেড়ি বাচ্চায় ঘর ভরে ফেলে, সিঁদুর–ধ্যাবড়ানো ফোকলাদেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত। কিন্তু উৎপলাকে নিয়ে তার জীবন সে–রকম নয় তো। ওদের মতন নয়–আর–এক রকম।

রববার সকাল বেলা মাল্যবান ঝিকে বললে, 'মাকে একটু ডেকে আনো তো।' তিন–চার বার ঝিকে ওপরে পাঠাতে হল।

উৎপলা নীচে নেমে এল; বললে, 'তোমার লজ্জা করে না?'

'কেন?'

'ঝিকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছিলে?'

'তোমার কাছে লোকজন ছিল, আমি তো নিজে গিয়ে ডাকতে পারি না।'

'লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত তর সইল না? আমি ওপরের ঘরে কী করি–না–করি, নীচের ঘরে বসে তুমি সে–সব গণেশ ওল্টাবে! আচ্ছা পেটোয়া গণেশ তো বাবা–'

'যাক, ওরা তো চলে গেছে–'

'তুমিই তো তাড়ালে–'

'যে–জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম–আমার এই ঘরটার কথা তোমাকে কদিন থেকেই বলব–বলব ভাবছি। ঘরটা কেমন থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে দেখছ তো।' ঘরের দিকে না তাকিয়েই উৎপলা বললে, 'তার আমি কী করব!'

'তোমাকে একটু গুছিয়ে দিতে বলছি–'

মাল্যবানের আতলস্পষ্ট বেকুবির দিকে তাকিয়ে উৎপলা কোনো কথা বললে না আর।

'ওপরে যারা ছিল, তারা চলে গেছে?'

এ–কথার জবাব না দিয়ে উৎপলা ওপরে চলে যাবার উপক্রম করছিল; পা বাড়াতেই কী যেন একটা জিনিস টপ করে টস করে উৎপলার পায়ের ওপর পড়ে ভেঙে ঝোল ছড়িয়ে দিল, শ্লিপার বাঁচিয়ে, উৎপলার পায়ের মাংসে চামড়ায়। দুহাত পেছিয়ে গিয়ে আলসের দিকে তাকাতেই পাখিটাকে চোখে পড়ল, মাল্যবানের জুড়ির মতই বোকা–বোকা বেকুব পাখিটার দিকে কেমন যেন লেগে থাকতে চায় চোখ; কেমন অদ্ভুত জায়গায় ডিম পেড়েছে, ডিমটাকে ফেলে দিয়েছে হয়ত নিজের অজান্তেই বেশি নড়াচড়া, ঘোরাফেরা, ডানা ঝাপটাতে গিয়ে, পা নাড়া দিয়ে; কী যে হয়ে গেছে, ডিম যে পড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, সে–দিকে খেয়াল নেই পাখিটার, হারানো নষ্ট ডিম সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই; কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে আলসের ওপর, গলা ফুলিয়ে বক–ব্রকম–ব্রুকম–ব্রুক ইর্‌–ররম্‌–রিরম–ররম্‌–রুক করছে পাখিটা। উৎপলা

জোরে–জোরে হাততালি দিতেই আরো একটা পাখি বেরিয়ে এল বিমের আড়াল থেকে; উড়ে চলে গেল পাখি দুটো ।

মেঝের ওপর পাখির বিষ্ঠা, পালক–ভাঙা ডিমের লালায় নিজের আঁশটে এঁটো পায়ের দিকে তাকিয়ে উৎপলা বললে, ‘খুব আগুনদার সোনার দরে গুদোম ভাড়া দিচ্ছে বুঝি জংলি পায়রার ঝাড়–’

‘তা দিচ্ছে,’ উৎপলার কথা ফুরোবার আগে মাল্যবান বললে, বেশ সমাহিত শান্ত ভাবে বললে, ‘পাখিরা আর কদ্দুর কী করবে; মানুষরা পাখিদের চেয়ে শয়তান; না–হলে পৃথিবীটা এ–রকম পৃথিবী হয়! নাঃ, ও–পাখিগুলোকে আমি কিছু বলি না ।’

‘আমি জাল পেতে রাখব । এক–একটা করে ধরে ঠাকুরকে দেব । এ–সব কেঁদো পায়রার মাংস খেতে বেশ–’

‘একটা বেড়ালের ছানা মেড়ে ফেলেছিলাম একদিন,’ মাল্যবান বললে, উৎপলার কথা সে শুনছে কি না–শুনেছে, বোঝা গেল না, ‘সেই থেকেই এ–সব বিষয়ে খুব সাবধানে চলতে আরম্ভ করেছি । এ–সব প্রাণীদের কিছু বলি না আমি ।’

‘বেড়ালের ছানা কে মেরেছিল?’

‘আমি ।’ মাল্যবানের চোখ খানিকটা বুজে এল ।

‘কবে?’

‘এই দিন পঁচিশেক আগে ।’

‘কোথায়?’

‘এই ঘরেই ।’

‘কই আমি দেখি নি তো ।’

‘সে রাত–দুপুরে হয়েছিল; কে এক জন ক্যাঁক করে ছেড়ে দিয়ে গেল । বাচ্চার কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে গেল । তারপর–’ বলে সে থামল ।

‘সেটাকে চাড় দিয়ে থেঁৎলে দিলে তুমি–’

মাল্যবান উৎপলার মুখের দিকে তাকাল একবার; পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে নিয়ে চোখ বুঝে ভেতরের দিকে তাকাল মাল্যবান; ভিজে পর্দার ওপর কামলণ্ঠনের ছবির মত এসে পড়ল সব; সেই রাত্রি, সেই বেড়ালের ছানা, ছানাটাকে (ছবি চলতে আরম্ভ করল) কেমন বিশ্রী ও নিকষ অপকৌশলে ধরে ফেলেছিল সে–কেমন অন্ধ হয়ে দেয়ালে আছড়ে মেরেছিল, কেমন কাতরাতে–কাতরাতে মরে গেল বাচ্চাটা–সেই সবের দিকে আপ্রাণ করুণায় দাঁত–মুখ খিচিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মল্যবান বললে,

'মানুষ হওয়া হবে কবে, তাই ভাবছি; কোনো দিক দিয়েই হতে পারি নি তো আজও। চেষ্টা করছি; করছি? পাখিদের কিছু বলি না আমি; ময়লার লপসি করছে ঘরদোর; খুব ভোগান্তি বটে, কিন্তু তাতে আর কী, আমি নিজের মনে থাকি, ওদের চাল–চিঁড়ে দিই, যব খেতে ভালবাসে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখি, খায় আর হাগে, হাগে আর খায়; মানুষের ভেতর দু–চার জনকে ছেড়ে দিলে প্রায় মানুষই এদের চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করে।' বলতে–বলতে মাল্যবান লজিকের সিঁড়ি ভেঙে–ভেঙে অবশেষে উৎপলার পয়ের দিকেও না তাকিয়ে পারল না, পাখির ডিমের লালায় ঝোলে নষ্ট হয়ে গেছে পাটা–

'কিন্তু এই পাখিগুলো', উৎপলার আগাপাশতলায় চোখ দুটোকে বেশ খানিকক্ষণ পাক খাইয়ে নিয়ে মাল্যবান বললে, 'একেবারে বেহেড হয়ে ডিম পাড়ে। যেন পাৎবাদামের গাছ থেকে বাদাম টপাটপ করে ঝরে। দিন–দিন মাল লোকসান করে–'

মাল্যবান কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে হাতে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে আকাশ–পাতালের অনেক বিশৃঙ্খল ঢেউ গুনে দেখল, তাদের সাজিয়ে নিযে কোনো নির্দেশের মত মুক্তাপ্রবাল দেখল যেন জ্বলে উঠে জলের শিখরচুড়ো হয়ে যেতে, এবং বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই আলোটিকেই ব্যাখ্যা করে বললে, 'কিন্তু, তাই বলে গুলতি ছুঁড়ে ওদের মারা উচিত কি? উচিত নয়।'

তারপরে স্পষ্ট হয়ে বললে, 'তোমার নীলাম্বরীটা ঠিক আছে তো–ভিজিয়ে দেয় নি তো?'

'আহা, কী মানিয়েছে তোমাকে এই ময়ূরকণ্ঠী নীলে–', মাল্যবান ভাবছিল, 'যেন উত্তরাকে নেতা-শেখাচ্ছে বৃহন্নলা। নাচের ঘোড়ে মিলেমিশে গেছে উত্তরা–বৃহন্নলা–কে উৎপলা কে বৃহন্নলা–' অনির্বচনীয় দেখাচ্ছে উৎপলাকে–অথচ দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিই তো আর নাচছে না, নড়ছেও না; অথচ দেখাচ্ছে উৎপলাকে যেন ক্ষুরধারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে–পুরুষের যে–তিলোত্তম পেলে মেয়েমানুষকে মহানারীর মত দেখায়, সেই রকম।

'আমাকে কয়েকটা বালিশের ওয়াড় তৈরি করে দেবে? বলো তো কয়েক গজ মার্কিন নিয়ে আসি।'

উৎপলা যাবার জন্যে তৈরি হল, 'থাক, দর্জির বাড়িই দেওয়া যাবে।'

স্ত্রীর সঙ্গে সেও ওপরে চলল।

গিয়ে বললে, 'আমাকে একটা পান দিতে পারো? ভেবেছিলাম, ছেড়ে দেব। কিন্তু লোভ সামলাতে পারি না।'

'কিন্তু উৎপলা নড়ছিল–চড়ছিল না; ছাদের ওপর রোদে–বাতাসে একটা ডেকচেয়ারে বসে ঘাড় কাত করে বেণী খসাতে লাগল; খুব আমেজ এসেছে উৎপলার শরীরের রসে উপলব্ধি করে নিজেরও গ্রন্থিতে

মাংসে একটা মন্থর, সুখ্যাত, মদির সুখানুভব ছড়িয়ে পড়ছিল মাল্যবানের। কিন্তু ওপরে থেকে লাভ নেই কোনো, মাল্যবানের মনে হল; এখন নীচে চলে যাওয়া উচিত।

নীচে গিয়ে মাল্যবান ঠিক করল, ঘরদোর সে নিজেই গোছাবে। তার পর মনে হল, ঝিকে দিয়ে গুছিয়ে নেবে। ঝি রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। মাল্যবান একটা বিড়ি জ্বালিয়ে ভাবল, গুছিয়ে কী লাভ!

কিন্তু পরক্ষণে সে নিজেই গোছাতে লাগল। বিশৃঙ্খলা ও নোংরামির ভেতর মনটা কেমন খিচখিচ করে ওঠে; কিন্তু সেদিনকার মতন পর্বত ঝেড়ে নিখুঁত ভাবে গোছাতে গেল না; ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, জিনিসপত্র ঠিকঠাক রেখে দিয়ে, বিছানার চাদর বদলে, নোংরা কাপড়গুলো কাছেই একটা লন্ড্রিতে ফেলে দিয়ে এসে কাজ সাঙ্গ হল তার।

রাতের বেলা বড্ড শীত; মোজাগুলো সব ছেঁড়া, একটা পুলওভার কিছুতেই কেনা হয় না, গায়ের আলোয়ান তেলে, জলে, রোদে বাতাসে ছাই হয়ে ছিঁড়ে–ছিঁড়ে পড়েছে, কয়েকটা তালিও মেরেছে সে, বড় বিশ্রী লাগে, একটা নতুন আলোয়ান কিনতে ইচ্ছে করে, ডোরাকাটা কালো মশারিটার ছ্যাঁদার অন্ত নেই, নোংরা পচা ছারপোকা গুঁইগুঁই করছে, একটা মস্ত বড় ছিপড়ের জঙ্গল হয়েছে মশারিটা।

রাতের খাওয়া–দাওয়ার পর নীচের ঘরে একটা ঠাণ্ডা টিনের চেয়ারে বসে মাল্যবানের মনে হাচ্ছিল দুর, এ–রকম জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে কী লাভ, কার লাভ!

বিছানায় এসে বসে মনে হল, জীবনটা সেই রকমই হ্যাঁচকা ব্যাপার। বিছানায় শুয়ে পড়ে, 'কেই–বা এখন শুতে যেত' ভাবছিল মাল্যবান; বসে–বসে কথাবার্তা, গল্প–তার পর শীতের রাতে–তার পর সারাটা শীতের রাত; এমন স্ত্রী কি আমি পেতে পারতাম না। হড়পা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি হাঁসের মত সাঁতার কাটতে চাচ্ছি, বাজপাখির মত উড়ে যেতে যাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম। কিন্তু বড় বেশি আত্মপ্রেম হয়ে পড়েছে তো আমার; যেন একটা ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর–কেউ নেই, যেন ব্যক্তিসমুদ্র নিয়ে যে–মনুষের ও সময়ের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে সেটা কিছু নয়। লেপ মুড়ি দিয়ে শীতের খুব গভীর রাতের আজকের আবহমানের ও ব্যক্তিসমুদ্রের রোল–যা নির্ব্যক্তিত্বে নিশোধিত হয়ে ফেনার কণার মত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্ধকারের থেকে খুব সম্ভব আরো ব্যাপক অন্ধাকারের ভেতর–সেই সুর শুনতে পেল সে; অতএব আলোকিত হয়ে উঠল যেন তার মন; আস্তে আস্তে সময়ের আশ্চর্য সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্থির হয়ে উঠতে থাকল তার মন।...

এত বেশি স্থির হল যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পৌষ মাসের শেষাশেষি মেজদার পরিবার এল।

মাল্যবান একটা মেসে গিয়ে উঠল। মেস ঠিক নয়–মাঝারিগোছের একটা বোডিং। একটা আলাদা কামরা বেশ গুছিয়ে নিল সে। মেজদা আর বৌঠান কিছুতেই ছাড়তে চায় নি মাল্যবানকে, কিন্তু তবুও সব দিক ভেবে সুবিবেচনা করে মেসেই যেতে হল তাকে।

মেসের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না তার। অফিস থেকে এসে নিজের জীবনের বিপর্যয়ের কথাই সে ভাবত–যে পর্যন্ত না ব্যক্তিঅতিক্রমণার দূর সমুদ্রসুর শুনতে পেত সে; সে–শব্দ শুনতে শুনতে গিয়ে রাত বেশি হয়ে যেত–ঘুম আসত তার আগে; সে–সুর প্রায়ই আজকাল শোনা যেত না, আসত না, স্পষ্ট করে ধরা দিতে চাইত না। গোলদিঘি কাছে ছিল–বেড়াতে যেত। এক–একদিন নিজের বাড়িতে গিয়ে তত্ত্বতলব নিয়ে আসে–চারদিকে ঘুরেফিরে দেখে মেজদা ও বৌঠানের অমায়িক মুক্ষিমিষ্টত্ব উপভোগ করে। তাঁরা এমন চমৎকার মানুষ–হয়ত খুঁটিনাটি নিয়ে দুজনে বচসা করছেন, কিন্তু তার ভেতরেও পরস্পরের জন্যে এক নাড়ীরই টান যেন, এক জোড়া বসন্তবউরির মত নীড়ের বাইরে, মুহূর্তেই নীড়ের ভেতরে যেন মানুষের মত শরীর ও বোধ নিয়ে–প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়েই যৌনসম্বন্ধের মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম ফুটে উঠছে। দেখে মাল্যবানের লাগছে মন্দ না, মানে খারাপ লাগে, কেমন বিশ্রি লাগে যেন; ব্যক্তিজলরাশি ভুলে গিয়ে ব্যক্তিকে, নিজের কী হল না–হল, সেটাকেই সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় বলে।

এ–জিনিসটা উপলব্ধি করে ব্যক্তিজলরাশির নিশ্চিহ্ন জলরৌদ্ররাশির ভেতর মিলিয়ে যেতে চেয়ে ঈষৎ ভাঙ খেয়ে কেমন ভাল লেগেছে যেন তার, এমনই একটা আস্বাদে, মিষ্টি গলায় মাল্যবান বলে, 'মেজদা, আপনাদের শুতে তো কোনো কষ্ট হয় না?'

'না। এই তো বেশ বড় ছাপ্পর খাট রয়েছে।'

'ওখানে একাই শোন বুঝি আপনি?'

'না।'

'ছেলেপুলেরা শোয় বুঝি আপনার সঙ্গে?'

'ওরা নীচে শোয়–পিসির কাছে।'

মেজদা বললেন, 'উনি আর আমি শুই এখানেই। একা বিছানায় ঘুম হয় না–পাশে, যা হোক অন্তত, একটা–শাড়ির খশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না। বুঝলে কি না....'

মাল্যবান নিজের কপাল থেকে একটা ডাঁশ উড়িয়ে দিল।

মেজদা গলা খাকরে বললেন, 'বিছানার চারদিকটা বেশ উম হয়ে থাকা চাই তো..... হা হা ... '

মেজবৌঠান হামানদিস্তেয় পান ছেঁচতে ছেঁচতে ঘরের ভেতরে ঢুকে ছেঁচা পানের বড়ি পাকিয়ে বিরাজবাবুকে দিয়ে গেলেন। তার পর হাত ধুয়ে বিরাজবাবুর দাবনা ঘেঁষেই যেন বসলেন–কোনো সঙ্কোচ নেই। মাফলারটা বিরাজের গলায় ভাল করে জড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'বড্ড শীত'; বালিশের নীচের থেকে এক জোড়া চকোলেট রঙের মোজা বের করে বিরাজ মিত্তিরের বাঁ পায়ের গোদে, সরু ডান ঠ্যাঙে পরিয়ে দিলেন মাঝবয়েসি আঙুলের সুকুশল সক্রিয়তায়–মোমের ঝরানির থেকে বেশি মধুর ঝরানির থেকে উঠে এসে যেন।

মেসে এসে মাল্যবান–যেন ফাঁপরে পড়ে গেল, কেউ নেই তার, কিছু নেই। এখানে ছোকরারা থাকে, আর থাকে এমন সব লোক–বিশেষ করে এক রকম শারীরিক সুখের জন্যে যাদের সব সময়েই লালা ঝরছে; রাতের বেলা বেরিয়ে যায় তারা; কোথায় থাকে–কি করে? কোনোদিন শেষ রাতে ফিরে আসে, কোনদিন আসে না। মেসের যাদের এ–রকম রাত করা বাতিক নেই. তাদেরও লালা ঝরছে বিশেষ এক রকম শরীরগ্রন্থির সুখের জন্যে মেসের রাতের বিছানায় শুয়ে থেকে। বছরের পর বছর সারাটা জীবন এরা মেসেই কাটিয়ে দেয়। এ ছাড়া গতি নেই–কিছু নেই–সংসার কারবার শক্তি নেই–

বিছানায় শুয়ে পড়ল সে; কিন্তু সেই মুহূর্তেই উঠে বসল। বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। গোলদিঘিতে গেল। ফিরে এল সেখান থেকে। খবরের কাগজ নিল; রেখে দিল; চুরুট জ্বালাল' নিভে গেল; ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল?

পরদিন সকালবেলা মাল্যবানের মেসের ঘরের কাছে রেলিঙের ওপর কতকগুলো কাক এসে ডাকছিল। মাল্যবান তার স্ত্রীর মুক্ষি–ওড়ানোর মত ঝটপট হাততালি দিয়ে হা–হা করতে–করতে উড়িয়ে দিল সেগুলোকে। পাশের ঘরের একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন মশাই, কী রকম বিরক্ত করে! কাল আট আনার কচুরি–হালুয়া এনে টেবিলে রেখে একটু মুখ ধুতে গেছি, এরই মধ্যে ঘরের ভেতরে ঢুকে খাবারের ঠোঙা লোপাট–'

'এই কাকগুলো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বড্ড বেয়াদব তো–'

'কিন্তু মাল্যবানের ইচ্ছে হচ্ছিল, এই কাকগুলোকে ডেকে সে কিছু খেতে দেয়–এগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে বলে কেমন একটু খালি খালি লাগছিল তার। রোজ সকালে সে ঘুমের থেকে উঠবার ঢের আগেই পুবের দিকের এই রেলিঙের ওপর বসে কাকগুলো ডাকতে থাকে। বিছানায় শুয়ে–শুয়ে তার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ে– মা–র কথা; সেই খড়ের ঘর–এমনি শীতের ভোর–এমনি কাকের ডাক। কোথায় গেল সে সব!

মাল্যবান ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের কাছে বসে এই সব কথা ভাবছিল। এমনি সময়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা একটা কাক উড়ে এসে মাল্যবানের ঘরের পাশে ট্রামরাস্তার দিকে রোয়াকের রেলিঙের ওপর বসল আবার। মাল্যবান অনেকক্ষণ এক ঠাঁই বসে থেকে কাকটাকে দেখতে লাগল–তার ডাক শুনছিল। পাড়াগাঁয় দাঁড়কাক থাকে, পাতিকাক থাকে; কলকাতায় পাতিকাক;–দাঁড়কাক দেখছে না তো। অনেকদিন দাঁড়কাক দেখে নি; একটা দাঁড়কাক দেখেছিল বড় রাস্তার একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপনের ছবিতে; একটা মদের বোতলের টাইট ছিপি ঠুকরে খুলতে চাচ্ছে–ফ্রান্সের বিখ্যাত মদের গন্ধে এমনি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে প্রাণীটি। মদের বোতলের বিজ্ঞাপনের দাঁড়কাক, কিন্তু তবুও চোখ তুলে দেখবার মত; এক ঝলকে জীবনের অনেক কটা বছরের আকাশ–বাতাস পাখি–প্রাণী সমাজ–উপলব্ধি উজিয়ে দিয়ে গেছে।

কাকটা উড়ে গেল কুয়াশার ভেতর দিয়ে–গোলদিঘির দিকে–একটা নিমগাছের ভেতর। এমনি উড়ে যেতে ভাল লাগে।

পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠোন ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও–বা শক্ত শাদা মাটি বেরিয়ে পড়েছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া–রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষের মত তার ছটকানো। শালিখ উড়ে আসত উঠোনে; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক–এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে, ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে রঙের আভা, চকিত চোখ দূরের দিকে, নীলিমার দিকে। কত উঁচু–উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিরে; সারাটা শীতকাল ঘুঘুর ডাক জারুল ঝাউ পাৎবাদাম আমের বন নিম হিজলের জঙ্গল কেমন ফুকরে–ফুকরে উঠত–রোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীর ঘুমে ভরে উঠত সেই পাখির ডাকে। মাঝে–মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, কেমন কলের মত, পাখিদের দেশের খুদে ঢেঁকির পাড়ের মত ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত-ঘুর-ঘুর-ঘুর-ঘুর করে ছুটে যেত তারা মাঠে ঘাসে–কী খুঁজত–কী চাই? সেই পঁচিশ–তিরিশ বছর আগের শীতের ভোরের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেন পৃথিবীর মনে কোনো দিন ছিল না; আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিক শক্তির গোলকধাঁধা নিয়ে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী। ফিকে কফির কোকোর মত রঙের গলা ফুলিয়ে কত পাতিকাক উড়ে আসত খড়ের উঠোনে; শন–শন করে উড়ে যেত ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই করে কোনো নদীকে কোনো দিঘিকেই না ছুঁয়ে, জলের ভেতরে ঝাপসা প্রতিফলিত হয়ে, শাঁ–শাঁ করে কোথা থেকে উড়ে যেত, তারা কোথায়; সকালের কুয়াশার দিক থেকে দূর বিদিকের পানে উড়ে যেত সেই কাকগুলো পৃথিবীটাকেই টেনে বার করবার জন্যে, উজ্জ্বল সূর্যটাকে সবাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে–যারা কাক নয়, পাখি নয়, তাদের জন্যও–ক্ব-ক্ব-ক্বক্ব–কেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।

সরস্বতীপুজোর দিন মাল্যবানের ঘরের পাশেই বোর্ডিঙের কয়েকজনে মিলে খুব মদ খেল। বোর্ডিঙের একটা হলের মত ঘরে বাঈনাচ হল। বোর্ডিঙের ঝি বাবুদের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসে নাচগান দেখল–শুনল; মাল্যবান অবাক হয়ে দেখছিল, ঝি একটুও সঙ্কোচ বোধ করছে না–এ যেন তার পাকাপাকি অভ্যাস; বাবুদের মায়ের মতন কখনো তার ঠাঁট, কখনো কারো–কারো বিশেষ গিন্নি যেন সে, তেমনি ভাবগতিক, কখনো–কখনো সকলের অন্তরঙ্গ বন্ধু যেন–নম্র অমায়িক, সকলকে হাতের ভেতর গুছিয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত, নানা রকম সহজ সুলভ ছেনালিতে সরস। কাল সকালেই গিয়ে তো আবার বাসন মাজতে বসবে। তখন এর ন্যালাভ্যালা মুখের দিকে মাল্যবান অন্তত তকিয়েও দেখতে যাবে না। এই বাবুরাও কোনো তক্কা রাখবে কি? কিন্তু আজ রাতে একে দিয়েই আসর জমানো। আসর জমাচ্ছেও মন্দ না। পান চিবোয়–সিগারেট টানে– গালগল্পের পাট নিয়ে এর কাছে তার কাছে ফেরে–একে না পেলে কয়েকটি বাবুর অন্তত আজ রাতের অনেকখানি ফুর্তি মাটি হয়ে যেত।

মাল্যবান সাত–পাঁচ ভাবতে–ভাবতে ভাবার মাথায় ভাবছিল; সরস্বতীপুজোর সঙ্গে এ–সবের কী সম্পর্ক। মদ বাঈনাচ ঝি–এ–সবের কী দরকার! কিন্তু এ–আসরের মধ্যে এমন কথা সে হয়ত একাই ভাবছিল। একাই সে কেমন এক! নিস্তব্ধ–কেমন যেন ঝক মেরে গেছে অন্য সবাইয়ের হল্লা জৌলুশের তুলনায়। কিন্তু এ–কথা ঠিক, এদের কারো ওপরই কোনো বিমুখ ভাব ছিল না তার।

মদ খেল না অবিশ্যি, আজ কেন যেন সিগারেটও টানতে গেল না, দু–একটা পান চিবুল মাত্র, কিন্তু আসর থেকে উঠে গেল না তো; বসে–বসে নাচগান দেখছিল–শুনছিল। গয়মতী (মানে কী, এ–নামের?) ঝিকে নিয়ে সবাই ফুর্তি করছিল, কিন্তু এই মাকড়ের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকির মুখের মত মেয়ে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে–মাঝে ভারি দুঃখ হচ্ছিল মাল্যবানের। ইলেকট্রিক লাইটের আলো মাঝে মাঝে মেয়েটির টিমটিমে চোখে এসে পড়ে, বাতির কড়া কড়কড়ে ঝাঁঝে সে কষ্ট পায়, এমন দুঃখ হয় মাল্যবানের; মাথার থেকে ঘোমটা খসে পড়ে মেয়েটির, ছোট্ট খুকিদের মত এতটুকু খোঁপা বেরিয়ে পড়ে–বড় কষ্ট লাগে মাল্যবানের; একটা ভাঙা চেয়ারের খোঁচা খেয়ে মেয়েটির শাড়ির অনেকখানি ছিঁড়ে যায়, নিজে সে তা বুঝতেও পারে না, কিন্তু মাল্যবানের সংবেদনায় গিয়ে লাগে খুব,–খুব; মেয়েটি সিগারেট টানতে–টানতে প্রায়ই বুকে হাত দিয়ে কাশে– সুবিধের লাগে না মাল্যবানের; কাশে যখন মেয়েটি তখন তার চোখ দুটো মাছের মত গোল হয়ে ওঠে–বড় বিশ্রী দেখায়–মাল্যবানের খারাপ লাগে, কেমন দুঃখ করে এই অদ্ভুত হাড্ডিসারের জন্যে, এই ব্যক্তিটির জন্যেই। মাল্যবান খুব ভাল বোধ করছিল না, অবাক হয়ে ভাবছিল, এত সিগারেট টানছে, এতে কি সুখ পাচ্ছে গয়মতী, টানছে আর কাশছে, এই কাশছে তবুও

এ–রকম খিঁচে সিগারেট টানছে, 'খুবই অদ্ভুত ভারি মজার বোধ হত জিনিসটাকে, কিন্তু দুঃখ হতে লাগল মাল্যবানের।

চার–পাঁচজন বাবু মিলে ঝিকে আলাদা একটা কামরায় নিয়ে গেল। মাল্যবান নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল, তাকিয়ে দেখল ঝিকে সবাই মিলে মদ খাওয়াচ্ছে।

মাল্যবান হাঁটতে–হাঁটতে ভাবল; এ কী–রকম ফুর্তি! কিন্তু তবুও প্রতিবাদ করতে গেল না; প্রতিবাদ করবার মত চোপা নেই তার, সে–শক্তি ও ঐশ্বর্য নেই; সে তাগিদও নেই; সে জানে, পৃথিবীর অনেক দিকেই এ–রকম অনাচার চলেছে, কেউ রোধ করতে পারে না, কারুর রোধ মানে না।

তেতলায় উঠে অন্ধকারের মধ্যে বারান্দায় খানিকক্ষণ সে পায়চারি করল। তারপর রেলিঙের কাছে এসে নীচের দিকে তাকাল একাবর; দেখল সেই ঝি কলতলার পাশে বসে মুখ থুবড়ে বমি করছে; তার আশেপাশে দুজন সঙ্গী শুধু। মেসের ঠাকুর বামদেব–লম্বা হিরগিরে মানুষ–মুখটা অনেকটা স্যার ত্রৈলোক্যের মত–ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং চড়িয়ে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিরাসক্ত ভাবে খইনি টিপছে–মাঝে মাঝে মাকড়শার জালের মত জড়িত চোখের দৃষ্টি তুলে ঝির দিকে তাকাচ্ছে। ঝির কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ছাপরা জেলার পূর্ণ কুর্মি। লোকটা বেঁটে, কালো, মুখে বসন্তের দাগ, উঁচু-উঁচু শাদা, দাঁত থেকে তবুও বিশ্রী গন্ধ বেরয়; কিন্তু হাসি–হাসি মানুষ; এই মেসে সব চেয়ে এই ঝিকেই ভালবাসে সে। ঝি কাকে ভালবাসে? পূর্ণকে নয়, ঠাকুরকে নয়, কাকে, জানে না মাল্যবান। উঠে–পড়ে ভালবাসার ব্যাপারে লেগে গেছে পূর্ণ আজ; ট্যাকে আজ কিছু টাকা আছে তার; ঝির সঙ্গে আজ রাতে কাজ হবে তার।

ওপর থেকে হটাৎ এক সঙ্গে কয়েকটা রোশনচৌক্তি বেজে উঠল যেন; 'পূর্ণ! পূর্ণ! পূর্ণ'

ওপরে মাল খাস্ত পড়েছে হয়ত মদের কিংবা মাংসের অথবা সোডা ওয়াটারের, এখুনি দোকানে ছুটতে হবে পূর্ণকে।

গয়মতী বললে, 'তুই যা পূর্ণ, বামদেব আছে, হুই বসে আছে–ওই ওতেই হবে–দেড়টা নাগাদ আসিস তুই।'

পূর্ণ আড়মোড়া ভাঙতে–ভাঙতে বসে বাঁকিয়ে নতুন মাটির কেঁচোর মত শরীরটাকে পাক খাওয়াল কিছুক্ষণ। তারপরে ধাঁ করে হাওয়া দিল।

বামদেব বললে, 'পরকাল ঝরঝরে করে রাঁড়ি তো হয়েছিস। কিন্তু আমি চক্কোত্তি বামুন, মনে রাখিস, পয়সা–টয়সা পূর্ণর মত আমি দিতে পারব না।'

'তুমি বামুন আছ, আমি হাড়ির মেয়ে নই, আমার বাপের নাম সিধু সরকার–'

'গোবরার সেই সিধু না কি রে? ঐ যে আসত, আর তুই পাত পেড়ে দিতি।'

'কসবার সিধু সরকার, তুমি দেখো নি তাকে ।'

'সরকারও এক রকম কায়েত বটে,' বামদেব একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'যাক গে, শোন বলি কায়েতের মেয়ে বমি করলি যে!'

'ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার ।'

'একটু বেসামাল হেয় গেছিস, গয়া; আর বমি করিব?

'না' ।

'বমি–বমি করে যদি বল আমাকে, আমি তো তোর পিঠে হাত দিলেই বেরিয়ে যাবে সব হড়–হড় করে–'

'নাঃ । শান্তি হয়েছে,' গয়মতী বললে, 'হাড় নড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে শরীরের ভেতর ।'

'তবে চ–'

'কোথা?'

'আর কোথা, বাবুদের খাওয়া–দাওয়া হয়ে গেছে সব । তুই তো খেয়ে আঁশবটি হাতে করে উগরে ফেললি সব ভ্যান–ভ্যান করে, দেখে–দেখে আমার হয়ে গেছে, আর খেয়েছি আমি!'

'নাও, নাও, খেয়ে নাও গে,' গয়া বললে খুব আত্তি দেখিয়ে, 'খইনি টিপছ তো টিপছেই, নাও ওঠো ।'

'পিবিত্তি নেই,' মুখটা কেমন যেন ভেঙেচুড়ে ফেলে বামদেব বললে, 'সারাদিন কড়া আগুনে রাঁধতে–রাঁধতে, তোর বমি দেখতে–দেখতে খাবার হাঁড়ি পেটের ভেতর শুকিয়ে আমার শালকাট হেয়ে গেছে গয়া ।'

কলতলায় বসেছিল এতক্ষণ, মাথায় একটা আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গয়া বললে, 'এও বলি বাপু, ভাল ঠেকছে না আমার; কেমন যেন ঠ্যাকার তোমার, বাপু, ভারি ঠ্যাকারে হয়েছে! তোমার নাম ধরেই ডাকছি তোমাকে, বামদেব–খাবে না? সত্যিই, কিছুই খাবে না!'

'নাঃ, অন্ন খাব না আজ আর, মেষ্টান্ন খাব!'

'আচ্ছা! আচ্ছা!' একটা মরুঞ্চে শ্যাওড়াগাছের মত বাতাসের ঝাপটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন হাসতে–হাসতে গয়া । রোয়াকের ওপরে বামদেবের কাছেই এসে বসল সে ।

'পূর্ণ কি দেড়টার সময়ে আসবে বলেছে?'

'কে জানে কী বলেছে,' ভারি বিপদ গুনে, বামদেবকে সালিশ মেনে ক্লান্ত মলিন চোখ দুটো বামদেবের চেনা চাওয়ায় সে খানিকটা স্পষ্ট করে তুলে গয়া বললেন 'বড্ড হুজ্জোৎ করে পূর্ণ । ওসব দেইজিপনা হবে না আজ ।'

'বাঃ, কী করে হবে, তোমার তো একটা মেয়েমানুষের গতর, গয়া। ও চায় সেটাকে পাঁচখানা করে নিতে।'

বামদেব শিবিরাজার আশ্রিত পাখিকে ভরসা দিয়ে বললে, 'ওসব কালকেউটের জন্যে বেউলার রাত জাগতে হবে না, গয়া। আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, ও বিষদাঁত সেঁধতেই পারবে না।'

শুনতে-শুনতে মাল্যবান নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বোর্ডিঙের খাওয়া–দাওয়া মাল্যবানের ভাল লাগছিল না। কী কতকগুলো ডাঁটা খোসা চোকলা–চাকলা দিয়ে একটা ঘ্যাট বানায়, রাঁধতে পারে না, তেল–মশলা খরচ করে না, বাজারের থেকে ভাল মাছ–তরকারি আনতে পারে না; 'এ–রকম হলে–বোর্ডিং ছেড়ে যাব আমি।'

একদিন বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার গোটা তিনেক পাঁঠা এনে নীচের ঘর একটা গুদামে বেঁধে রাখল সারাদিন পাঁঠাগুলো চেঁচায়, মাল্যবান কেমন একটু অস্পষ্ট অমানবসাধারণ্য ভাবে চিন্তা করে ভাবে ঃ এই যবক্ষার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট! হয়ত এরা টের পেয়েছে, মরতে হবে শিগগিরই; আমিষ গন্ধ যেন পেয়েছে, নিজেদের মৃত্যুর; মানুষের হাতে তৈরী যে সেটা, তাও বুঝেছে। সৃষ্টি, মাল্যবান ভেবে যেতে লাগল, প্রকৃতি এদের এত মোক্ষম কামপ্রবৃত্তি দিল কেবলই সন্তান বানিয়ে কেবলই সেগুলোকে ধ্বংস করবার জন্যে। এদের লালসার বাড়াবাড়ির সুবিধে নিয়ে এদের দিয়ে কেবলি এদের ঝাড়বংশ বাড়াচ্ছে কাটছে–খাচ্চে মানুষ। মানুষের চেয়ে বড় শয়তান কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর! শয়তান! শয়তান।

মাল্যবানের মন বেঁকে দুমড়ে গেল কেমন যেন, ইচ্ছে হচ্ছিল ম্যানেজারকে গিয়ে বলে, 'এগুলোকে আপনি ছেড়ে দিন আচায্যি মশাই, টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব আমি।' কিন্তু ছেড়ে কী হবে, অন্য কেউ ধরে খাবে। নিজেদের সুমাংস নিয়ে এরা মানুষ–সামজ থেকে অক্ষত হয়ে এড়িয়ে যাবে? কোথায়? কোন অজব্রহ্মাণ্ডে? তা তো নেই।

ম্যানেজার মনোহার আচায্যি তিনটি বেশ পুরুষ্ট তেলচুকচুকে পাঁঠা এনেছে। বোর্ডিংয়ের সকলেই পাঁঠার মাংস খাবার জন্যে খুব ব্যস্ত, কবে পাঁঠা কাটা হবে এ নিয়ে চারদিকে এমন একটা প্রবল তাগিদ, সব্বাইয়ের জিভে এত জল যে মাল্যবান এদেরই মধ্যে একজন মানুষ, ভাবতে গিয়ে মনে হল, সহজ বিবেকেই মাংস খায় মানুষ, যেমন ফল–ফসল খায় সহজ বিবেকে; কেবলমাত্র তার মতন এক–আধজন মানুষের বিবেকে এসে খোঁচা লাগে; মানুষ হিসেবে সে হয়ত অস্বাভাবিক; নিজেকে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হল তার–মানুষ হিসেবে। মাল্যবান ঠিক করল, এ পাঁঠার মাংস সে খাবে না।

কিন্তু চার–পাঁচ দিন পরে ম্যানেজার পাঁঠা তিনটি বিক্র করে ফেলল; ঠাকুর পলতার তরকারি, ট্যাংরা মাছের ঝোল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে সাজিয়ে ভাত নিয়ে এল। মাল্যবানের মনটা কেমন একটু বিরস

হয়ে উঠল, বললে, 'ঠাকুর মাংস আর আমাদের কাপালে জুটল না।' কিন্তু খেতে-খেতে মাল্যবান নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বললে ঃ ছি, তিনটে প্রাণীর জীবনের চেয়ে আমার মাংস খাওয়া হল বেশি?

পরদিনই গুদামঘরে দুটো পাঁঠা দেখা গেল আবার; মাল্যবান একটু ধাক্কা খেল; ভাবল; এ আবার কী। ভাত খেতে-খেতে ভাবল; ও মাংস আমাদের খাবার জন্যে নয়, হয়ত পাঁঠার ব্যবসা ধরেছে ম্যানেজার। ভেবে-খানিকটা ঠেসে গেল তার সাত্ত্বিক উপলব্ধির সমস্ত তোড়জোর।

সন্ধ্যের সময় ম্যানেজার, নিকুঞ্জ পাকড়াশিকে বলছিল, 'না, না এ-পাঁঠা আমি কালই কাটব।'

শুনে কেমন একটু ভরসা পেল যেন মাল্যবান। গোলদিঘিতে ঘুরতে-ঘুরতে ভাবল; জীবনে এমনি নোংরা হয়ে পড়েছে আজ-কয়েক টুকরো তো মাংস; সেজন্যে দুটো প্রাণীর মৃত্যু আমার কাছে এমন আশা-ভরসার জিনিস হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু, এ তো স্বাভাবিকতা, শেয়াল-বেড়াল, চিতে বাঘ, কেঁদো বাঘের মত মানুষ হিংসাত্মক তো। মানুষ হয়ে স্বাভাবিক ভাবে অহিংসা করে বেড়াবার মত নেই তো তার। কিন্তু, তবুও মাল্যবান সংকল্প করল, এ-মাংস সে খাবে না।

এবং খেল না বটে, কিন্তু মাংসের বাটি ফিরিয়ে দিতে ভারি বেগ পেতে হল তার, রাবড়ির তিন চামচে ঝোল মোটেই সরস লগল না, খুব সক্রিয় আক্রোশে ম্যানেজার ঠাকুরের ওপর মারমুখো হয়ে উঠল তার মন। মানুষের জীবন সহজ সুন্দর মোটেই নয়, মাল্যবানের নিজের জীবনটাও সরল নয়, সত্য নয়, অনুভব করছিল সে।

মেসের বিছানায় শুয়ে সমস্ত লম্বা শীতের রাত এক-একদিন বেশ ঘুম হয় তার। এক-একদিন ঘুম তেমন হয় না-বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে। ইচ্ছে হয়, পরের দিনই বাড়িতে চলে যাবে সে; সকালবেলাও সেই ইচ্ছে থাকে। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই সেই ইচ্ছের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারে সে, মেসের জীবনের থোর-বাড়ির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এক একদিন শেষ-রাতে গভীর অন্ধকার শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এত ভাল লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এত নিরর্থক মনে হয় যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভয় করে তার।

মাঝে-মাঝে সে খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখে।

বোর্ডিঙের অনেকগুলো রাত তার বেশ চমৎকার কেটে গেল। একটা জিনিস খুব ভাল লাগে; একজন ছিপছিপে লম্বা সুন্দর যুবক রোজ শেষ রাতে নানা রকম ইংরেজি বাংলা কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়; মাল্যবান আলোড়িত হয়ে ভাবে-এর জীবনে সমারোহ আছে বটে, কিন্তু সেটা ফিচেল জিনিস নয়, সিত্যই গভীর; ওর মতন জীবন পেলে হত।

সকালবেলা কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক একটা কাক মাল্যবানের বারান্দার রেলিঙের ওপর উড়ে আসে, কুয়াশার এলামেলো ছেঁড়া–ছেঁড়ার ভেতর দিয়ে ডানা মেলে গোলদিঘির দেবদারু নিমগাছের দিকে মিলিয়ে যায়; প্রকৃতির দিঙনির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন। কুহক অনুভব করে মাল্যবান। কিন্তু তবুও অতিপ্রাকৃত নয়–কী স্বাভাবিক ভাবে নিবিদ, এই আলো, পাখি, আকাশের ভাষা।

একদিন সকালে একটা কাক মাল্যবানের রেলিঙের ওপর এসে বসল। কাকটা ঘুরে বসে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে অনেকবার ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই গলার ভেতর দিয়ে আওয়াজ বেরল না পাখিটার। গলায় হিম লেগে স্বর বসে গেছে। আবার যে, আওয়াজ ফিরে পাবে পাখিটা হয়ত তা বোঝে না। নিজের গলার আওয়াজ হারিয়ে না জানি কী সে ভাবছে। মাল্যবান তাকে একটা বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দিল। কাকটা ঘরের ভেতর ঢুকে বিস্কুটের টুকরোটাকরা খাচ্ছে, কাগজপত্রের ভেতর খচখচ করে লাফাচ্ছে। মাল্যবানের ঘরে অনেকক্ষণ রইল কাকটা–কয়েক টুকরো বিস্কুট খেল।

হপ্তা–খানেক পরে বোর্ডিঙের বারান্দায় পায়চারি করতে–করতে মাল্যবান দেখল, গাঁটরি–বোঁচকা নিয়ে একজন ভদ্রলোক বোর্ডিঙের একটা বড় অন্ধকার দুর্গন্ধ কামরায় চুপচাপ বসে আছে। যেমন কামরা তেমন তার মানুষ–এ দুজনের দিকে তাকালে জীবনের প্রত্যাশা, ভরসা, ভুঁইপটকা হয়ে ফুরিয়ে যায়। মাল্যবান কয়েকদিন দেখল, ভদ্রলোক চুপচাপ বসেই থাকেন শুধু, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না কিচ্ছু না। মাঝে–মাঝে চশম এঁটে এক–আধটা বই তুলে নেন, কিন্তু পড়া যে বেশি দূর এগোয়, তা মনে হয় না।

একদিন ভদ্রলোকটির ঘরের ভেতর ঢুকে মাল্যবান বললে, 'কেমন আছেন?'

নাকের ডগা থেকে চশমাটা কেমন একটা এলোমেলো টুনটুনির ঠ্যাঙের মত খসিয়ে নিয়ে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দুটো চোখ কচলাতে–কচলাতে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার শরীর বিশেষ ভাল নেই।'

'কী হয়েছে?'

'এই কদিন থেকেই জ্বর–'

'তা, এ–ঘরে থাকেন কেন?'

'কোথায় থাকব আর?'

পকেট থেকে জড়িবড়ি একটা ন্যাকড়ার নুড়ি বার করে চোখের পিঁচুটি পরিষ্কার করতে–করতে ভদ্রলোকটি বললেন, 'সস্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই বাসা ছেড়ে দিয়েছি–'

'ওঃ!'

'এই মাস–পাঁচেক হল মারা গেছেন; পঁচিশ–তিরিশ বছর এক নাগারে ঘরসংসার করেছি। ছেলেপুলে নেই। এখন আর পোড়োবাড়িতে মন টেনে না। পয়মন্তদের ঘুম দেখতে চলে এলুম তাই–আপনাদের পাঁচজনের।'

মাল্যাবানকে শুধোলেন, 'আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন তো?'

'আছেন–আছেন–' মাল্যবান কেঁপে–কেঁপে মন্ত্রপড়ার মত করে বললে।

'বাপের বড়ি গেছেন বুঝি?'

মাল্যবান একটু থতমত খেয়ে বারান্দার রেলিঙের দিকে, যেখানে কাকগুলো এসে বসত সেদিকে কুয়াশার যে–শুঁড়িপথের ভেতর দিয়ে গোলদিঘির নিমগাছে উড়ে যেত তারা সেদিক পানে, তাকিয়ে রইল।

'বাস্তবিক, আমাদের অবস্থা আপনি বুঝবেন না', ভদ্রলোক কাঁচাপাকা দাড়ির ওপর হাত রেখে বললেন, 'কেউ বোঝে না। আমার স্ত্রী একটা শাদা উলের গোলা হাতে করে হাসতে–হাসতে চলে গেলেন–'

'উলের পেটি?'

'হ্যাঁ, ভেস্ট বুনছিলেন আমার জন্যে–'

'ওঃ!'

'বুনছিলেন আশ্বিন মাসে–দেশে শীত পড়বার আগে। গেল শীতে গরম জামার অভাবে খুব কুঁদেছিলুম; না, তত বেশি কুঁদি নি বটে, আমি তো ছেলেমানুষ নই, তেব কোঁ–কোঁ করতুম খুব সত্যিই ভারি শীতকোঁৎকা হয়ে গিছলুম, টের পেয়েছিলেন উনি। কাজেই এবারে উলের জামা বানিয়ে দিচ্ছিলেন–'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাকে বলেছিলেন যে, তোমাকে দুদিনেই ভেস্ট বুনে দোব; বলে দিনরাত 'কুরুচ' কাঁটা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একুনে চারটে হাত, বুঝলেন মশাই, দু হাতে ভেস্ট বোনো, দুহাতে সংসারের ব্যাগার ঠ্যালো, বাটনা–কুটনো রান্না, আমার চানের জন্যে গরম জল, আমার বাতকোমরে তেল মালিম–ধনেশ পাখির তেল–আমার নাম বিপিন ঘোষ–'

বিপিনবাবু বললেন, 'সে আর–এক হিস্ট্রি, আপনাকে পরে বলব কী করে ধনেশ পাখির তেল জোগার হল; রাস্তায় যে ফিরি করে বেড়ায়, সে–জিনিষ নয়, খাঁটি মাল; এতেও আমার গিন্নির হাত ছিল–'

'গিনি বটে', বিপিন ঘোষের দিকে তাকাতে–তাকাতেই মাল্যবান তার চোখ দুটো হোঁৎ করে কড়িকাঠ ঘুড়িয়ে এনে খুব একটা সাতর্কতা বোধ করে বললে, 'এখানে–সেখানে পাঁচি খেঁদি, এর বউ ওর বউ–সব ডাঁটো তোতাপুরি তো। আপনি হাড়েমাসে কিষেণভোগটা পেয়েছিলেন, দাদা, আহা–হা, চলে গেলেন!'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে পেয়েছিলুম', বিপিনবাবুর কাঁচা ঘায়ে খোঁচা লাগলেও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'চলে গেছেন আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় করে–'

মাল্যবান অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, এ–কথা বলতে গিয়ে বিপিনবাবু একটুও টসকালেন না, কারখানার থেকে শিরা, গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড তৈরি করে এনেছে যেন লোকটা ।

‘উলের জামা দুদিনেই শেষ করে এনেছিলেন প্রায়–এই এত বড় প্রমাণ সাইজের ভেস্ট, দেখছেন তো আমার কেমন দশাসই চেহারা–’

বিপিন ঘোষ পকেট থেকে এক বাক্স কাঁচি সিগারেট বার করে মাল্যবানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘নিন, স্যার,–’

নিজে একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, ‘ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়, আমি তাঁকে সাত–পাঁচ একটু বিশেষ ঘরোয়া আলাপ–মানে, আমিই তাঁকে সেদিনকার রাত্তিরটার জন্যে আগে থেকে বায়না দিয়ে রাখছিলাম; কথায়–কথায় ওঁর কেমন বুননের ঘর ভুল হয়ে গেল–সমস্ত জামাটাকে খুলে ফেলতে হল আবার–’

‘আহা!’

‘আবার মারিয়া হয়ে আরম্ভ করলেন । তার ওপর রাতে কিছুটা অত্যাচার হল সেই বায়নার কাজে; কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল–প্রায় শেষ রাত অব্দি । রক্তের চাপ বেড়ে গেল খুব । সকালবেলা একটু দেরিতে উঠে রোদে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই উল আর ‘কুরুচ’ কাটা নিয়ে । আমি একটা জলচৌকিতে বসেছিলুম মুখোমুখি । আমার সঙ্গে হেসে–হেসে কথা বলতে–বলতে, ব্যাস, ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলেন । তখুনি হয়ে গেল–’

বিপিন ঘোষ আর–কোনো কথা বললেন না । একটা সিগারেট, দুটো সিগারেট, তিনটে সিগারেট শেষ করলেন তিনি । তারপরে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে নিজের গলার কণ্ঠটার ওপর হাত রাখলেন বিপিন ঘোষ । চোখ দুটো অনবরত নাচতে লাগল তাঁর । একটা জহরকোট গায়ে এঁটে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন তার পর ।

মাল্যবান অবিশ্যি সেই দিনই অফিস থেকে ফিরে উৎপলার কাছে গেল । গিয়ে বললে, ‘না, মেসে আর না ।’

‘কেন?’

‘আমি আজই চলে আসছি ।’

‘কোথায় থাকবে, শুনি?’

‘যে জায়গায় ছিলাম–নীচের তলা–’

‘সেখানে জায়গা নেই ।’

মাল্যবান বললে, 'এ–বাড়ির কোনো ঘাপটিতে পড়ে থাকব, সে–জন্যে ভাবতে হবে না–'

'খেপেছ?' উৎপলা একটু মেজাজে–মেজাজে বললে, 'আড়ি পাতবার জায়গা নেই বাড়িতে; তুমি বেশ রঙে আছ খুব যা–হোক। সঙ্কুলান হচ্ছে না, তোমার মেসেই থাকতে হবে; ওদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না।'

'কিন্তু, এটা তো আমার বাড়ি।'

'তা যদি বলো, তা হলে মেজদাকে নিয়ে আমরা অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করি–'

'না, না, সে–কথা আমি বলছি না–' একটু বলার বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে অনুভব করে মাল্যবান বললেন, 'তুমি চলে গেলে এ–বাড়িতে এসে কী হবে আর। সে তো মেসের মতই হয়!'

একটা কথা বলতে হবে বলে মাল্যবান বললে, 'মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে এক–একদিন রাতে বড় ভরসা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, যদি মরে যাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আর–কোনোদিন দেখা–'

উৎপলার মুখের দিকে তাকিয়ে মাল্যবানের জুত লাগল না তেমন; যে–কথাটা পেড়েছিল, সেটার শেষ করতে গেল না আর, বললে, 'ঐ যা, আমার লাইফ ইনসিয়োরেন্স প্রিমিয়ামগুলো দিয়ে দিয়েছ তো। টাকাকড়ি তো তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম–

'খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হল! তা হবেই তো, আজকাল তো রাবনের চিতে জ্বলছে কি না এই বাড়িতে।'

'মেজদা বলেছেন, তোমাকে আর–একটা পলিসি নিতে।'

'তা আর হয় না।'

'কেন, বয়েস তো তোমার আছে।'

'না, বয়েসের জন্যে নয়।'

'মেজদা বলেছেন, মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না, তিনি পাশ করিয়ে দিতে পারবেন।'

'তিনি এজেন্ট, তাঁর গরজ ঢের,' মাল্যবান এঁচড়ে পাকা ছেলের মত একটু ঠাট্টা–অমান্যির হাসি, (মনে হচ্ছিল উৎপলার), ছড়িয়ে বললে। কেমন সেয়ানার মত মুখ করে বসে রইল, আসল জায়গায় মাল্যবানকে ধরা যত সহজ মনে করেছিল উৎপলা, তা নয় যেন।

'মেজদার কম্পানিতেই তোমার করা দরকার।'

'তা আমি জানি। করবার সাধ্যি থাকলে করতাম বই–কি। যে–দুটো আছে তা, ল্যাপ্‌স্ না করলেই আমাদের কুলিয়ে যাবে–'

'না, না, করে ফেলো।'

'টাকা নেই।'

'সে আমি বুঝব।'

'তা দেখো। কিন্তু আমি যা বলছিলাম, মেসে থেকে কেমন ঢল শুকিয়ে যায়–এক–একদিন রাতে; বিয়ে করার আগে তা মেসে থাকতাম, কিন্তু এখন পারছি না, কিছুতেই পারছি না। মেসের বাবুরা বলে, বেশ বনে–জঙ্গলে তো চরছেন দাদা হাতির মত, আবার খেদার হাতি হবার সাধ!'

'বলে না কি?'

'আমি তো বাড়ির হাতি', মল্যবান বললে, 'বন দিয়ে আমি কি করব?'

'বল নাকি তুমি? রাজবাড়ির হাতি বল নাকি নিজেকে?'

'বলি, শিববাড়ির হাতি–'

'কেন, শিববাড়ির কেন?'

'ঐ যা মুখে আসে, তাই বলি। আমি কাল মেস থেকে উঠে আসব।'

'মেসে গিয়ে তোমার শরীর সেরেছে,' উৎপলা বললেন, 'হুট করে কিছু করে বসো না। থাকো মেসে কিছুদিন। মেসেই তো বরাবর ছিলে, মেস–মেস ধাত হয়ে গেছে তোমার, ঘর–সংসার মানাচ্ছে না ঠিক। সেদিন আমার ভাইপো–ভাইঝিদের জন্যে নীচের ঘরটা গোছাচ্ছিলাম, মেজ বৌঠান বললে, ঘরটাকে শালগ্রামটি মেসের কামরার মতই করে রেখেছে দেখছি–'

'তাই নাকি? তুমি কী বললে?'

'বলব কী আর। বুদ্ধি খরচ করে কথা বলতে হলে চুপ করে থাকতে হয়।'

মাল্যবান চারদিকে চোখ পাকিয়ে তাকালে, একটা ঢেকুর তুলল, গোঁফের কোনায় একটা মোচড় দিয়ে বললে, 'মেজ বৌঠান যা খুশি তা বলুন। আমার স্ত্রী–সন্তান নিয়ে নিজের মনের ভাবে থাকবার অধিকার আমার রয়েছে। আমার যা খাসদখল, তা ফেলে মেসে গিয়ে আমি থাকব?'

মল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'স্বামীকে কি মেজ বৌঠান মেসে পাঠিয়ে সুখ করছেন?'

উৎপলা ঢিলে খোঁপা খসিয়ে ফেলে চুলের গোছা হাতে তুলে আঁট করে খোঁপা বাঁধতে–বাঁধতে বললে, 'ওদের তো আর আমাদের মত নয়–'

'হয়েছে, হয়েছে', মাল্যবান শিংশপা রাক্ষসীকে কাছে না পেয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে চুরুটটাকে সেপাট করতে–করতে বললে, 'পাঁচ রকম দশ রকম, সব রকম জানা আছে আমার। ল্যা–ল্যা করতে করতে আমি পরের বাড়ি চড়াও করতে যাই না তোমার ভাজের ভাতারের মত। আমার নিজের রকম নিয়ে আমি নিজের বাড়ি থাকব–শালগ্রাম হব, শিবলিঙ্গ হব–যা খুশি হব–ওদের কী–'

উৎপলা মেজাজ না চড়িয়ে ঠাণ্ডা ভাবেই বললে, 'ঠিক কথাই তো। তবে কালকে হবে না। আট–দশটা দিন পরে এসো, নীচের ঘরটা তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে–'

শুনে মাল্যবানের মনের গরমটা স্নিগ্ধ হয়ে এল; 'আট–দশদিন পরে?'

'হ্যাঁ।'

'নীচের ঘরটা খালি করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে।'

'কে করছে ব্যবস্থা?'

'আমরাই।'

ব্যবস্থা তো হচ্ছেই তার জন্যে, উৎপলাই করছে, মিছেই চুরুটটাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে সে। লোকসানি চুরুটটাক ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা টাকটা চুরুট বের করে মাল্যবান বললে, 'আমি ও–সব তেমন মানি–টানি না, তবে তথ্য হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়–'

'কোন জিনিসটা?'

'ঐ যে–আমাদের রাজযোটকে বিয়ে হয়েছিল–তোমার মেজদা ঠোঁট ওল্টালেও তোমার বড়দা–সেজদা খুশি হয়েছিলেন–তোমার বাবা তো খুবই–'

মাল্যবান খুব গনগনে আগুনে বেশ বানিয়ে ফেলল চুরুটটাকে, কথা বলার ফাঁকে–ফাঁকে, চুরুটটাকে বেশ প্যাঁচ মেরে টেনে–টেনে। কড়া গলায় একটু চাপা হাসি হেসে উৎপলা বললে, 'কে? বলেছিল তো পরেশ ঘটক।'

'হ্যাঁ, তিন রাত্তির মাথা ঘমিয়ে তিনি স্থির করেছিলেন।'

'রাজযোটক', উৎপলা ফিক করে হেসে উঠল শঙ্খনীর মত চনমনে, গলায়, রাজযোটক–বিয়ের ফলাফল ফ্যাকড়া টেংড়ি বলো গিয়ে পরেশ ঘটককে তার নির্বন্ধের বাইরে।'

'তুমি পণ্ডিতকে উড়িয়ে দিতে চাও।'

'পাণ্ডিত্য দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই, আমি যা অনুভব করি, তাই বলি।'

'কী করো তুমি–অনুভব?'

'কথা বাড়াতে পারি না', উৎপলা তুষের আগুনে যেন বাতাস লাগিয়ে একটু ধিক–ধিক করে উঠে বললে, 'এখন তোমাকে মেসে তাকতে হবে। আট–দশদিনে নীচের ঘরটা খালাস করে দেয়া যাবে হয়ত, বলেছিলাম; কিন্তু তা হবে বলে মনে হয় না, মাস দেড়েক তো লাগবেই।'

উৎপলা এক পাটি সুন্দর দাঁত বের করে হাসবার মত মুখ করে, তবুও না হেসে, গম্ভীর ভাবেই বললে। দেখতে–দেখতে দাঁতের পাটি অদৃশ্য হয়ে গেল তার। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট মিশ খেয়ে কঠিন হয়ে রইল খুব আঁট সিঁদুরের কৌটোর মত।

'মেসে কদিন থাকব?'

'যদ্দিন দরকার।'

'মেজদারা কবে যাবেন?'

'তা আমি কী করে জিজ্ঞেস করব তাঁদের?'

'তাদের নিজেদেরও একটা বিবেচনা থাকা দরকার।'

উৎপলা মাল্যবানের থেকে কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে যেন বললে, 'সেটা কি তুমি তাঁদের শিখিয়ে দেবে?'

হাতের চুরুটটার দিকে চোখ পড়ল মাল্যবানের। চুরুটটা দাঁতে আটকে নিয়ে টানতে লাগল। টেনে–টেনে বেশ ছাই জমেছে যখন চুরুটের মুখে–তখনও, সে কী করবে আর, চুরুটটা টানতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলে মনে পড়ল মাল্যবানের। বিপিন ঘোষের গল্পটা উৎপলাকে বলতে শুরু করল! মুখবন্ধ শুনেই উৎপলা বললে, 'দুধপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে না?'

'কই, না তো।'

'এই যে, আমি পাচ্ছি।'

'না, না, গল্পটা শোনো, ও, পাশের বাড়িতে দুধ উথলে পড়েছে হয়ত–'

পাশের বাড়িতে যে, তা টের পেল উৎপলা; নাক আছে তার, কান আছে, আরো নানা রকম সূক্ষ্ম পক্ষীসংস্কার পশু অনুভূতি রয়ে গেছে তার, পাশের বাড়িতে ঠাকুরটা যে হেঁসেল থেকে সরে গিয়ে পানের দোকানে গল্প করছে, তা তো চোখ–কান খাড়া করে টের পেয়ে নিচ্ছিল সে, তুবও একটা খিচ রয়ে গিয়েছিল উৎপলার মনে, 'আমাদের দুধ পুড়লে সব্বোনাশ–মেজদার–'

'তোমার উনুনে দুধ নেই। আমি জনি। এই তো হেঁসেল থেকে ঘুরে এলাম, রাঙি ছ্যাঁচড়া রাঁধছে–' মাল্যবান চুরুট নামিয়ে বললে।

উৎপলা তার ঘন কালো চুলের (বেণীর ভেতরে কোনো ট্যাসেল জড়ানো নেই) মস্ত বড় আবদ্ধ খোঁপার ওপর হাত রেখে চাপ দিতে–দিতে বললে, 'না রে বাপু, তোমার বিপিন ঘোষের কেচ্ছা শোনবার সময় নেই আমার। তুমি নিড়বিড়ে বলেই ওসব বিশ্বাস কর। খুব ভোগা দিয়েছে বিপিন ঘোষ; কিছু টাকা খসিয়েছে নিশ্চয়।'

মাল্যবান বিক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'টাকা যদি কিছু চাইত আমার কাছে, আমি দিতাম বই–কি। কিন্তু টাকা চাইবার লোক বিপিন ঘোষ! তা নয়। তুমি তার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারতে। লোকটার বাস্তবিকই সব গেছে। দশ মিটিন বসে পর–পর তিনেট সিগারেট খেল–আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না–তারপর একটু গলায় কণ্ঠায় হাত দিতেই চোখ–মুখ একেবারে, পাঁশগাদার কুঁকরোটাকে কোথাও দেখতে না-পেয়ে মোচলমানের ধেড়ে মোড়গের মত, ভেঙে পড়ল যেন বিপিন ঘোষের। কোনো কথা না বলে একটা জহরকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

মাল্যবান বিপিন ঘোষের সঙ্গে একশোয়াসে হয়ে গেছে; যেন তারই স্ত্রী মরেছে, ঘর ভেঙে গেছে, কিন্তু তবু তো অন্তর থেকে সহ্য করবার শক্তি শানিয়ে নিতে হচ্ছে তার, এমনই একটা ভাঙা কাসি জোড়া দেবার মত ভরাট, সাহসিক মুখে উৎপলার দিকে তাকাল তার স্বামী।

'এমন উল্লুকও থাকে, তোমার ঐ বিপিন ঘোষের মত?'

'উল্লুক বললে, উৎপলা?'

'তোমার ট্যাক থেকে খসায় নি তো কিছু?'

'কেন খসাবে? তুমি ভেবেছ কী বল তো দিকি–'

'ভোগা দিয়ে খসায় নি তো কিছু তোমার মতন ঢ্যাপঢেপে মানুষের কাছ থেকে?' উৎপলা চোখে–মুখে চিনি–মিছরির দানা ছড়িয়ে মাল্যবানের কোমরে একবার নিজের হাতটা জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ভালই করেছ তা হলে। কিছু লাগবে আমার কাজ। কত আছে সঙ্গে! মাল্যবানের গলায় একবার হাতটা জড়িয়ে নিয়ে মিষ্টি মুখে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'যা আছে তাই দাও।'

মাল্যবান গড়িমসি করতে–করতে বললে, 'দিচ্ছি। কিন্তু আজ আর মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানে একটা রাতের ব্যবস্থা হতে পারে।'

টাকা হাতে নিয়ে উৎপলা বললে, 'খেতে তো পার এখানে এ–বেলা।'

'না, না, খাওয়ার কথা নয়; একটু ঘুমোবার ব্যবস্থা হতে পারে?' কোথায় শোও তুমি?'

'আমার পঞ্চাশটা টাকার দরকার।'

'আচ্ছা, ধার করে দেব–'

'কবে!'

'কালই। আজ পঁচিশ টাকা দিচ্ছি। কোথায় ঘুমোয় মনু? আর তুমি?

পরদিন মাল্যবান এসে বললে, 'ভেবেছিলাম, শিগগির এদিকে আসব না আর।'

উৎপলা কোনো কথা বলছিল না।

'কই, না এসে পারলাম না তো তবু,' মাল্যবান একটা চেয়ার টেনে বসল ।

'ওখানে বসলে যে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'দেখলে, আমি নিড়িবিলি একটু কাজ করছি ।'

শুনে মাল্যবান একটু তাড়া দিয়ে বললে, 'তা কাজ করো–কাজ করো–আমি তো বাধা দিতে আসি নি । কার জন্যে ব্লাউজ সেলাই করছ?'

সেলাই-এর কলের হাতলটা আলগা মুঠোয় ধরে ঘোরাবে কি না ভাবছিল উৎপলা । জামাটাকে কলের সুচে ঠিক গুছিয়ে নিয়ে উৎপলা কল চালাতে লাগল ।

'সেলাই-এর কল তোমার লক্ষ্মী । কেমন বলবন করে ঘুরছে তোমার হাতে বিষ্ণুর চাকার মত একেবারে সতীদেহ কেটে ফেলে; বাঃ! বাঃ!' বললে মাল্যবান; সতীদেহ কেটে ফেলার কথা বলে সুভাষিতই বলেছে মনে হল মাল্যবানের; নিজের মনের বিজ্ঞান–নির্জ্ঞানে যে–অপর উৎপলাকে কাঁধে নিয়ে ফিরছে, সে টুকরো–টুকরো করে কেটে দিচ্ছে এ–উৎপলাকে ।

উৎপলা বেশ কল নিয়ে থাকতে পারে, এস্রাজ–সেতার নিয়েও । 'বড্ড একঘেয়ে লাগে রাতের বেলা মেসে; এস্রাজ শিখে নিলে হত ।'

'তুমি বাজাবে এস্রাজ?'

'কেন, হবে না আমার?'

বলে হরিকাকা কাছা দাও; হরিকাকা বলে, কাছা আমার খসল কোথায় যে দেব–' উৎপলা কল ঘোরাতে–ঘোরাতে ঘুরিয়েই চলল, পট করে সুতো কেটে যাওয়ায়, একটু থেমে নেড়ে–চেড়ে, বললে, 'না, কাটে নি, ঠিকই আছে ।'

'ববিনে সুতো আছে?'

'আছে, ঠিক আছে, হাওড়ার ব্রিজ হয়ে আছে; নাও, সরো–দিক করো না ।'

মাল্যবান উৎপলার হাতের চাকা–ঘুরুনির দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু মনটা চোত মাসের ফলকাটা তুলোর মত শত বাতাসে–শতধা নীলিমায় যে উড়ছিল ।

'ছেলেরা রাস্তায় সাইকেল হাঁকিয়ে যায়–বেনেটোলা, নবীন পালের লেন পটলডাঙা, কলেজ স্ট্রিট, কলাবাগান, হাতিবাগান, গোয়াবাগান–চৌরঙ্গির চৌমাথা । ভারি রগড়, কিন্তু এক–একটা জিনিস কিছুতেই শিখতে পারলাম না–বাইক করা, উর্দু বলা, পায়জামা চপ্পল শেরওয়ানি কিংবা সায়েবি স্যুটে পাড়ায়–পাড়ায় ল–ল করে বেড়ানো–'

উৎপলা চুপচাপ কল ঘোড়াতে–ঘোরাতে আরো বেশি নিঃশব্দ নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়ল ।

'কেরানির চাকরি আমাকে জুতিয়ে মারল । ইচ্ছে করে এই সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু নিজের ভাবে থাকি, তুমি সেতার বাজাও, আমি শুনি–সারাটা দিন এই রকম ।'

উৎপলা কলের দাঁতের ভেতর থেকে ব্লাউজটা বের করে এনে একবার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল; সেলাই-এর এখনো ঢের বাকি । মাল্যবান যে অনর্গল পাঁচালি পেড়ে চলেছে, সে–দিকে কান না দিলেও অবচেনার পথ দিয়ে মনের কানে কিছু–কিছু শুনেছিল ।

'ধরো, আর কুড়ি–পঁচিশটা বছরতো সামনে রয়েছে । জীবনের একটা রকমারি হবে নাকি এর মধ্যে?' কী বলো তুমি, রকমারি হবে তো বটে? ভাল হবে–সুভালাভি কেটে যাবে? কী বলো গো?'

'আরো কুড়ি বছর বাঁচবে বলে আশা কর?'

'বেঁচেও তো যেতে পারি ।'

'অত বেশি বেঁচে কী লাভ?' উৎপলা ব্লাউজের দিকে মন রেখে তবুও নিজের কথার দিকে মন দিয়ে শান্ত ভাবে, 'আমার নিজের কথাও বলছি– জীবনের আমাদের কী সম্ভব অসম্ভব বুঝলাম তো অনেক দিন বসে; এখন শান্তিতে সরে পড়লেই তো বেশ–'

উৎপলার কথা শুনে মাল্যবান খানিকটা বিরক্ত বিচলিত হল, পকেট থেকে মনের ভুলে বিড়ি বের করে জ্বালিয়ে ফেলছিল, প্রায়, কিন্তু স্ত্রীর সুমুখে বিড়ি সে আজকাল খায় না, সিগারেটও বার করলে না, বললে, 'বিদায় নিলে আমিই নেব, বেঁচে থেকে তোমার ঢের লাভ হয়েছে । আমি এক–একদিন রাতে মেসের বিছানায় শুয়ে ভাবি; তোমার কথা । বাস্তবিক বেশ পড়তা নেই বেটে কি তোমার জীবনে? কত লোকজনের সোরগোল তোমার ঘরে দিনরাত । তুমি নরকে বসলেও আশেপাশে একশটা নষ্ট চন্দ্র । তোমার মেজদা আর বৌঠান–এঁরা তোমার কাছে থেকে যত সুখী, তুমি নিজে তার চেয়ে ঢের বেশি সুখী এঁদের পেয়ে । কী বলো?'

মাল্যবন চোখ বুজে কথা বলছিল । চোখ মেলে উৎপলার দিকে তাকাল । কাজ করছিল, কথা বলবার কিংবা মুখ তুলে তাকাবার সময় ছিল না উৎপলার ।

'সত্যিই, তোমার জিনিস ছিল ঢের, সদ্ব্যবহারও ছিল–' বলতে–বলতে মাল্যবানের মনে হল নিজের বলিয়ে মুখটাকে দেখতে পেয়েছে সে; নিজের মুখটার মুখোমুখি এসে পড়েছে, মুখটা মুখ নেড়ে চলেছে শুধু, উৎপলার হৃদয়ে প্রতিফলিত হতে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে কী ভীষণ মুখ নেড়ে চলে সে, চিড়িয়াখানার একটা বানরের আকছার ছোলাভাজা চিবোবার মত । এই হল তার কথা বলা? ভাব প্রকাশ করা?

উৎপলা এক মনে কল চালাচ্ছিল। এর যে টনক না নড়ে, তা নয়, কিন্তু অন্য-কোনো যৌন-পরিস্থিতিতে অন্য-কোনো মানুষের সঙ্গে? আচ্ছন্ন সারস-বকের মত নিজের বুকের পালকে মুখ গুঁজে সমাধান খুঁজছিল মাল্যবান, কিন্তু কিছু বের করতে পারল না সে।

বুকের পালক মাংসের ভেতর থেকে মুখটা খসিয়ে এনে যেন মাল্যবান বললে, 'থাক, মৃত্যুর কথা আমরা কেউই না বলি যেন আর। বেঁচে থাক, যতিদিন সময় বাঁচিয়ে রাখে। দেখা যাক, কী হয়। ভরসা রাখাই ভাল। আমাকে একটা বাজনা শিখিয়ে দাও না–এই এস্রাজ–'

'হিমাংশুবাবু ভাল এস্রাজ বাজাতে পারেন, তাকে ধরো।'

'তাঁকে ধরব?' আমি কি হিমাংশুবাবুর ঘাড়ে এস্রাজ শিখতে চেয়েছি?'

'কেন, খুব তো সহজ, তিনি তো প্রায়ই আসেন।'

মাল্যবান উৎপলার হাত, পেট্রোলিয়ামের গন্ধ, সেলাই-এর কলের চাকা, ব্লাউজ তৈরির দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকিয়ে শেষে বললে, 'নাঃ বাজাতে কি সবাই পারে, মিছিমিছি বলছিলাম।'

এস্রাজের কথা সে আর তুলতে গেল না। 'মনুর শরীর কেমন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে দেখলাম! কী হচ্ছে?'

'দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে' উৎপলা বললে।

'কী খায়?'

'কী জানি।'

'পেটে সয় না হয়ত যা খায়, পেটের রোগ হয়েছে, শুকিয়ে যাচ্ছে তাই। না কি কিছু খেতেই পারে না, ভাল কিছু খেতে পায় না?'

উৎপলা একটা সেলাই-এর বই খুলে কতকগুলো নকশার দিকে মন নিবিষ্টি করছিল, মাল্যবান কী বলছে, না বলছে, তা সে বুঝেছে কী না, বোঝা যাচ্ছিল না, কোনো উত্তর দিল না উৎপলা।

'মনুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'হচ্ছে না কি।'

'আদ্ধেক হয়ে গেছে, টের পাচ্ছ না তুমি?'

'রোগে ধরেছে হয়ত,' উৎপলা বললে, 'হয়ত ওর বাপের মনের রোগে ধরেছে ওকে–'

মাল্যবান তাকিয়ে দেখল সেলাই-এর বইটা ইংরেজি; বই নয়–একটা জার্নাল হয়ত, জার্নালের পাতা নেড়েচেড়ে দেখছে উৎপলা। একেবারে ঝুঁকে পড়েছে পত্রিকাটার ওপর। উৎপলা সেলাই–এ এম–এ পাশ করবে, ডক্টরেটও পাবে হয়ত, কিন্তু মনু তো, সুতোশাঁখ সাপ হয়ে যাচ্ছে–কেমন সরু–কী ভীষণ সিটে-

মরুঞ্চে। এই হালে চললে মাল্যবান মেসে থাকতে–থাকতেই–এ বাড়ির হালচালের ভেতর মনুকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। কঠিন হবে।

'মনুর লিভার খারাপ–সেই পিলগুলো দাও লিভারের?'

'না।'

'কেন।'

'কোথায় হারিয়ে গেছে ওষুধটা।'

'হারিয়ে গেল! তা হলে তো আজই কিনে দিতে হয়।।'

'তা দিও।'

মাল্যবান কথাবার্তায় রকম–সকমে একটু নষ্টামির আঁচ ধরতে পেরে বললে, 'মিছিমিছি কিনে কী লাভ–যদি না খাওয়ানো হয়।'

'তাও তো বটে।'

'এ–পথ নয়, ও–পথ নয়, ঠিক পথটা ধরা দরকার, অনুভব করে মাল্যবান বললে, 'তুমি তো বলছ এ–বড়িতে কোনো জায়গা নেই।'

'তাই তো জানি।'

'ছাদে একটা ক্যাম্পখাট ফেলে শুয়ে থাকলে কেমন হয়?'

'তা তুমি নিজে বুঝে দেখো।'

'তোমার কী মত?'

'আমরা বাড়ি দেখছি।'

'কেন?'

'কিছুকাল বাপের বাড়ি থাকব গিয়ে। বড়দা আসছেন কলকাতায়–সেজদা আসছেন।'

বাড়িও দেখা হচ্ছে না, কেউই আসছেন না, জানে মাল্যবান। বিচিত্র জ্ঞানপাপের বোঝাটা পিঠে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে কল চালাচ্ছিল।

মাল্যবান চলে গেল।

মাল্যবান গোলদিঘিতে গেল। গোলদিঘিতে অনেকক্ষণ ঘুরল। তারপর মেসে এসে গেলে। খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুতে গিয়ে মাল্যবানের মনে হল মনুর জন্যে পিল কিনে দেওয়া হয় নি তো।

রাত কম নয়। তখনো দু–একটা ফার্মাসি খোলা ছিল। এক ফাইল লিভারের পিল কিনে নিয়ে উৎপলাকে দেবার জন্য একেবারে ওপরের ঘরে গিয়ে উঠল। গিয়ে দেখল, মেজদা, মেজবৌঠান আর উৎপলা তিনজনেই খাওয়াদাওয়ার পর ছাপরখাটের ওপর পা ছড়িয়ে, হাসি–তামাশা দোক্তা–পানের মজলিশ বসিয়ে দিয়েছে। ওষুধের ফাইলটা উৎপলাকে দিয়ে মাল্যবান নীচে নেমে যাচ্ছিল। মেজদা বললে, 'ও জামাই, পালালে যে–ও জামাই!'

মাল্যবান একেবারে নীচের ঘরে নেমে এল। দেখল, ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মনুর খাটের কাছে এসে দাঁড়াল; ছোট্ট মেয়েটার ধঞ্চের কাঠির মত শরীরটা পড়ে আছে–ফুঁ দিলে উড়ে যাবে যেন–এ–শরীরে মাংস লাগবে এসে কোনো প্রক্রিয়ায়–কোনো রকম প্রক্রিয়ায়ই–সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না; ওষুধে, ভাল জায়গায় চেঞ্জে গেলে যে–কাঠামোর শরীর সারতে পারে আশা করা যায়, মেয়ের শরীরের সে–কাঠামোটুকুই নেই। হাড়ের মতন নয়–শুকনো সেলাহাকাঠির মত কয়েকখানা হাড় আছে শুধু।

মশায় খাচ্ছে; বাতাস করে মশারিটা ফেলে দিল মাল্যবান। মনুর বুকের ওপর কম্বলটা টেনে দিল।

মাল্যবানের মন শুকিয়ে যেতে–যেতে ভরে উঠল–কী জিনিশে? তা কামনা নয়–স্ত্রীলোকের জন্যে পুরুষের ভালবাসাও নয়; মনুর জন্যেও–তার এই একমাত্র সন্তানটির জন্যেই একটা নির্বিশেষ পিতৃস্নেহ শুধু নয়, কেমন একটা সর্বাত্মক করুণা এসেছে–মনুর জন্যে, যে–সব ছেলেমেয়েরা এখানে ঘুমিয়ে আছে, বিপিন ঘোষের স্ত্রী বিপিন ঘোষ, মেজদা, বৌঠান, এমনকি নিজের স্ত্রীর জন্যে। এ–মুহূর্তে কোনো তিক্ততা বিরসতা বোধ করল না। সে, কোনো যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা–নারীকে ভালবাসা–এ–সব স্তর ও ফাঁদ উতরে গিয়ে একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতার কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন অতিমানুষের মত হয়ে উঠল মাল্যবান।

রাস্তায় নেমে মাল্যবান, মহাপুরুষদের মত, মনে হল ভালবাসা বা কামনা নয়, করুণাই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির অগ্নিকারুকার্যের ভেতরে আপতিত শিশির–ফোঁটার মত খচিত করে রাখে।

প্রেম খুব বড় জিনিস বটে, নটীর প্রেমের চেয়ে নারীর প্রেম বড়, নারীর প্রেমের চেয়ে বড় সব্বায়ের জন্যে ভালবাসা, পুরাণপুরুষের জন্যে নিবিড় আকর্ষণ। কিন্তু করুণা? একটা কীট, সেই মড়া বেড়াল–ছানাটা, মনু, বিপিন ঘোষের স্ত্রী, বিপিনবাবু নিজে, এমন–কি মাল্যবানের নিজের স্ত্রী–সকলেই তো মাল্যবানের হৃদয়ের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে পুরাণপুরুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে।

মাল্যবান মেসের দিকে হাঁটতে–হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, 'ছি–ছি, এ–জন্যে অভিমান জেগেছে না কি আমার হৃদয়ে? আমার প্রাণে সৃষ্টির বড় করুণা এসেছে বলে অহঙ্কার বোধ করছি না? না, না,–করুণার সঙ্গে অভিমানের কোনো সম্পর্ক নেই; এই প্রেম নয় তো, এ সব চেয়ে দীনতম জিনিস, তুচ্ছতম। আমি

সবচেয়ে নিকৃষ্টতম–সবচেয়ে নিকৃষ্টতম–আমি সবাই-এর কৃপার পাত্র, সকলেই পরমপুরুষের করুণাভাজন, অতএব সকলেই সেই পুরুষের প্রিয়পাত্র–এই যে অনুভব, এটা করুণা ।

কিন্তু মেসের বিছানায় শুয়ে, করুণা, শীতের রাতের তুলোওঠা গরম লেপের ভেতর স্খলিত হতে–হতে যখন নারীপ্রেম নাগরীপ্রেম, এমন–কি, গ্রন্থি–মাংসে গিয়ে, আঘাত করতে লাগল, তখন মাল্যবান পাড়াগাঁয়ে ছেলেবেলার কত ছোলার খেত, বড় দিঘি, চাঁচের বেড়ার ঘর, শীতের রাতে পোয়ালের গরম খড়ের গাদি, ফোড়নের মত চারদিকে শিশির ভেজা মাঠ, পেঁচার পাখার খসখসানি, দূরে সুভাবনীয়তম কাল পাখির ডাক–সময়ের ভাঁড়ার ভেঙে–ভেঙে মাল্যবান, বার করতে লাগল সেই সব । মিনিট দশ–পনের পরে মনে হল মাল্যবানের অনেক মুখের হামলা, অনেক ঝামেলা, কী ভীষণ ওতপ্রোত ভাব–কী হট্টগোল । ।

আরো কয়েক মিনিট পরে ঃ যদিও আর–কয়েকটি মুখের দাবিও কম নয়, তবুও আজকের নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনের জন্যে নেহাতই আকস্মিক ঘটনার মত একটি মুখ বয়ে গেল তার বুকের ভেতর; সে মুখ তার স্ত্রীর নয় ।

রাত তিনটের সময় মেসের চৌবাচ্চার থেকে ফিরে এসে হি–হি– করে কাঁপতে কাঁপতে মাল্যবান ভাবছিল ঃ তার জীবনের সারাৎসার মুহূর্তে তার স্ত্রী কোনো কাজে লাগে না ।

মেজদারা যতদিন রইলেন শরীর ও মনের নানা রকম অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে মাল্যবানকে মেসে থাকতেই হল ।

এই রকম করে সাত মাস কেটে গেল । তারপর মেজদারা চলে গেলেন । কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসেও মাল্যবান বিশেষ সুবিধে পেল না এবার আর । কোনো ওষুধপথ্য কিছুই গায়ে লাগে না, মনুর শরীর দিনের পর দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে–এ কথা ভেবে মাঝে–মাঝে দাম্পত্যজীবনের অমৃত যে বিষফল, কিংবা বিষফল নয় বঁইচির ফল–তা যে বিষফল নয় কিংবা বিষফল, এ ধোঁকাটা ভুলে যেতে হয়; প্রণয় আশঙ্কার চেয়ে দয়া জিনিসটাকে ঢের বড় বলে মনে হয় আবার ।

অমরেশ বলে একটি মানুষ–মধ্যবিত্ত, বা হয়ত আর একটু ওপরের সমাজের–প্রায়ই আসছিল উৎপলার কাছে আজকাল । অমরেশের রঙ ফর্শা বলতে পারা যায় না–লম্বা চেহারায় ঠাট আছে বেশ, মনের উৎকর্ষ তার শরীরের প্রতিভার মত অতটা চোখে না পড়লেও সাংসারিক বুদ্ধিতে সে কৃতীকুশল–প্রায় সিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছে । বয়স পঁয়ত্রিশ–ছত্রিশ বছর হবে । বিয়ে করেছে আট–দশটা বছর হল–তিনটি ছেলেপুলে আছে । উৎপলার সঙ্গে কবে, কোথায় তার পরিচয় হয়েছিল–হয়ত এখানেই এখনই প্রথম পরিচয়, জানা নেই মাল্যবানের কিছু । অমরেশ ও উৎপলা দুজনে মিলে অনেকটা সময় গান–বাজনা নিয়ে থাকে–দুজনের

মেলামেশা শালীন স্বাভাবিক কি না এই বিতর্কে অফিসে বাসায় অনেকটা সময় মাল্যবানের মন অভিভূত হয়ে থাকে–মনুর কথা ভুলে যায় সে–দয়া জিনিসটাকে ঢের অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। এই রকম ভাবে দিন কাটছিল। মনু আজকাল নীচের ঘরে মাল্যবানের সঙ্গেই শোয়। অমরেশ সাইকেলে চড়ে আসে। সাইকেলটা নীচে রেখে ওপরে চলে যায়; রাত নটা–সাড়ে নটা–দশটার সময় বেরিয়ে যায়। তারপর মাল্যবান ওপরে খেতে যায়। গিয়ে দেখে, উৎপলা এমনই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে আছে যে কথা বলে তাকে বাধা দিতে ভয় করে। খেতে–খেতে মাল্যবান ভাবে, উৎপলার অন্য–সমস্ত চেনা–পরিচিত লোকের চেয়ে এই অমরেশ ঢের আলাদা জীব ঃ অন্য সবাই যেখানে হাত ছেড়ে, ঘাঁৎঘোঁৎ খুঁজে ফিরেছে, অমরেশ সেখানে টিক 'শাদাওয়ালা পিলাগে'র ওপর হাত রেখেছে পাকা মিস্ত্রির মত।

ভাবতে–ভাবতে থালার ভাতগুলো নোংরা কড়কড়ে শুকনো চিঁড়ের মত মনে হয় যেন মাল্যবানের; ইটের কুচির মত চিঁড়ে খেতে হবে ডাল দিয়ে মাছের ঝোল দিয়ে; সব মিলেমিশে সুরকি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও কী যেন কিসের একটা ভয়ে–কাকে ভয়, কেন ভয় ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না সে, সে–আস্তে –আস্তে চিবুতে–চিবুতে নিঃশব্দে গলার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নেয় সব। কিন্তু তবুও অমরেশ সম্বন্ধে একটা কথাও স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না মাল্যবান।

বুঝতে পারল, নিজের মনটা তার স্বাতীর শিশির হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়, কিন্তু শামুক–গলির মত ক্লেদাক্ত জিনিস। শরীরটার খাঁজে–খাঁজে যে রয়েছে মাংস–মাংসপিণ্ড, সেগুলোকে অনুভব করে মাল্যবান। একটা অদ্ভুত গলগণ্ডের মতন যেন শরীর–তার মন এক চিমটে সময়ের কিনার থেকে দুদিনের জন্যে ঝুলে আছে এই সৃষ্টির ভেতরে।

মনু খাচ্ছে; কিন্তু খেতে–খেতেই টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনুকে জাগিয়ে দেবে কি, না উৎপলা মনুকে কানে ধরে ঘুমের মিথ্যের থেকে ঘরের সংসারের গুমোট মিথ্যের ভেতর জাগিয়ে দেবে?

মনু ঘুমিয়ে আছে, কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না।

অপরূপ চিত্রিনী যেন আজ শঙ্খিনী হয়ে উঠেছে–টেবিলের এক কিনারে বসে–খাচ্ছে না কিছু উৎপলা; চিনে মাটির ডিশ একটা সামনে রয়েছে, তার, কিন্তু তাতে ভাত নেই, চোখ তার ছাদের ওপারে অনেকখানি খোলা পৃথিবীর দিকে ফেলাতে পারত সে, কিন্তু ছাদের দিকে পিঠ রেখে দেয়ালের পানে তাকিয়ে আছে সে–কিন্তু তবু দৃষ্টি তার অনেক দূরে চলে গেছে–মাঝখানে দেয়ালটা কোনো বাধা নয়–চোখে তার ব্যথা নেই–উদ্দীপ্তিও নেই কিছু–আছে, কেমন আলোর প্রতিফলনের থেকে টের পাওয়া যায় যে–আলোর উৎসকে, সে–সবের আসা–যাওয়ার মত একটা ঠাণ্ডা নিঃশব্দ ভাবনাময়তা; মনের এ–রকম আশ্চর্য পরিণতির ভেতর নিশ্চুপ হয়ে থাকতে উৎপলাকে তো দেখে নি কোনোদিন মাল্যবান। এ কি ভাল, না মন্দ?

এর মানে কী?

'তুমি খাবে না, উৎপলা?' মাল্যবান গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে।' 'তুমি খাবে না?' এবার একটু জোরে বলতে হল তাকে।

ঈষৎ নড়ে উঠে উৎপলা বসবার ভঙ্গি একটু ঠিক করে নিতে গেল। সে কীভাবে বসেছিল? ধরনটা তো ঠিক এই মুহূর্তের উপযুক্ত নয়। ঘণ্টাখানেক আগে এ–রকম ভাবে বসলেও চলত; কিন্তু এখন তো এ–রকম ভঙ্গি চলে না। তা ছাড়া শাড়িটা কোমরে কেমন ঢিলে হয়ে আছে–খুবই ঢিলে–একেবারেই খুলে গেছে তো–উৎপলা দাঁড়াতে গেলেই সমস্ত শাড়িটাই খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

'এখন কটা রাত?'

'বেশ রাত হয়েছে, দশটার কম তো নয়।' মাল্যবান বললে।

'আজ খেতে দেরি হয়ে গেল।'

'না, এমন কিছু নয়, আমার খিদে ছিল না।'

'শীতের রাত–দশটা কম নয় তো।'

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? এতক্ষণ? কে?' আস্তে–আস্তে একটার–পর একটা প্রশ্ন পেড়ে উত্তরের জন্যে থেমে রইল মাল্যবান।

'ও একজন লোক।' উৎপলা কোমরে হাত দিয়ে শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিল।

মাল্যবান না দেখল যে তা নয়, খানিকটা রাতের ঠাণ্ডা টেনে নিতে–নিতে দেখল আর–একবার; উৎপলা দেখল মাল্যবান দেখল; মাল্যবানের টনটনে জান নেই, বৌ তা জানে; কিন্তু তবু মাজার কাপড় আঁটসাট করে নিতে–নিতে উৎপলার মনে হল; মানুষটা তো ঘোড়েল কম নয়, আমার দিকে নজর পড়েছে তার; কিন্তু আমি কী করেছি, আমি তো কিছু করি নি।

'ও একজন লোক যে, তা তো আমিও দেখেছি–'

'তবে আর কী–দেখেই তো ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, যখন ওপরে উঠছিল, দেখেছিলাম মানুষটিকে। নীচে সাইকেল রেখে গেল।'

'তারপর?'

'আমি ওকে চিনি না তো। এ–বাড়িতে দেখি নি কোনোদিন এর আগে।' উৎপলার নিজের ডিশের ওপর খানিকটা জল ছিটিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে দু–চামচ ভাত রেখে বললে, 'আমার কাছে যারা আসে, সকলকেই কি তুমি চেন?'

'অল্পবিস্তর মুখচেনা হয়ে গেছে।'

'কারা আসে বলো তো?'

'তাদের নাম বলতে পারব না, তবে রাস্তায় দেখা হলে ভুল হবে না।'

'চেনা আছে বুঝি সকলের–'

'তা আছে,' মাল্যবান আসল কথার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কিন্তু, এ কে?' ভাতের সঙ্গে অল্প মাখন মেখে নিয়ে একটু নুন আর কাঁচা লঙ্কা ঘষতে–ঘষতে উৎপলা বললে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তারা?'

'তা আমি কী করে বলব। সেটা তোমার নিজের নির্বন্ধের কথা। সেখানে তো আমি হাত দিতে যাই নি কোনোদিনি।'

'উৎপলা কাঁচা লঙ্কার বিচিগুলো বেছে বেছে ফেলে দিচ্ছিল, বললে, 'ভালই করেছ, কিন্তু আজ হাত বাড়াচ্ছ কেন?'

'মনু ঘুমিয়ে পড়ছে।'

'তা তো দেখছি।'

'জাগিয়ে দেব?

'এখন না।'

'ভাতগুলো তো চিঁড়ের মত।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কড়কড়ে লাগছে তাই।'

'ঠাকুর এ–রকম বেলাবেলিই রেঁধে চলে যায় কেন?'

'শীতের রাত, কতক্ষণ বসে থাকবে; হাতের আরো দু–পাঁচটে কাজ সেরে বাড়ি যেতে চায়–সেই চেতলায়–' বলতে–বলতে খেতে আরম্ভ করল উৎপলা এবার; কাঁচা লঙ্কার কিছু–কিছু বিচি আছে এখনও ভাতের ভেতর; অনেকগুলোই সে বেছে ফেলে দিয়েছে।

'আমি অবিশ্যি বসিয়ে রাখি নি তাকে।'

'আমি তোমাকে বলি নি তো যে তুমি দায়ী–'

মাল্যবানের মনে হল উৎপলার কথাবার্তায় আগের সেই খড়খড়ে ভাবটা কেটে গেছে যেন, কথা স্বাভাবিক, গলা নরম, আলাপচারির তাৎপর্যে মমতা না থাকলেও ভাবগ্রহণ আছে, আছে ষত্ব–ণত্বের চেতনা–মাল্যবানের সৌকর্যের জন্যে।

পরদিনও সন্ধ্যের সময় অমরেশ এল। অমরেশ তার সাইকেলটা মাল্যবানের ঘরের এক কোণায় তালা মেরে আটকে রেখে গেল। মাল্যবান অফিস থেকে ফিরে বিছানায় শুয়েছিল। তার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে অমরেশ বললে, 'কী করছেন আপনি?'

'শুয়ে আছি।'

'অফিস থেকে এলেন?'

'এই এলম।'

'আপনার স্ত্রী আছেন?'

'হ্যাঁ, ওপরেই আছে উৎপলা।'

অমরেশ ওপরে চলে গেল। মাল্যবান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। কিন্তু বাইরের একটা আলো ঘরের ভেতর ঠিকরে পড়ছে, অমরেশের সাইকেলটা ঝিকঝিক করে উঠছে তাই। যখনই সাত–পাঁচ ভাবে মাল্যবান–অন্ধকারের ভেতর চলে যায়; সুফলা ফলার মত অন্ধকারটা কেটে সাইকেলটা ঝলসে ওঠে আবার; মাল্যবানের মনে হল এ হচ্ছে উপচেতনার সঙ্গে চেতনার ঝগড়া, অবচেতনা ঘুমের দিকে টানে–মৃত্যুর দিকে; চেতনা অবহিত হতে বলে, ঢেলে সাজাতে বলে; আচ্ছা ঢেলেই সাজাবে সে।

চা খাওয়া হয় নি তো। চা খাবে কি? ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল বাবু চা–জলখাবার খাবেন কিনা–তাকে না করে দিয়েছে মাল্যবান।

গোলদিঘিতে যাবে কি? না, কই যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মাল্যবান শুয়েই ছিল। ওপরে এক–আধটা গান হয়ে গেছে। এস্রাজও বেজে গেছে কিছুটা সময়। গান সহজে আসে–শীতের শেষে পাতা যেমন আসে শিমুলের, জারুল–পিয়ালের ডালে–ছেলেটির গলায়; খুব স্বাভাবিক ভাবে খুব ভাল গাইতে পারে সে; কোনো এক জায়গায় গিয়ে তারপর ব্যক্তিত্বের দিব্যি স্পষ্টতা আছে ছেলেটির (ছেলেটি কেন বলেছে অমরেশকে সে? চেহারায় সকালবেলার সরসতা এখনও খানিকটা লেগে আছে বলে?)–সে কি স্বরকৌশলের সিদ্ধি শুধু? আন্তরিকতা? আত্মা? বুঝতে পারছিল না মাল্যবান। অমরেশের চেয়ে ভাল গান শুনেছে সে অবিশ্যি, কিন্তু এটাও আঘাত করে এসে–দুরকম ভাবে যদিও–শিল্প–শেফালির আঘাতটাই তবুও নিবিড়তর যেন। এস্রাজ বাজাল কি উৎপলা? তার পর এক ঘণ্টা–দেড় ঘণ্টা চুপ মেরে আছে সব–উপরে কোনো লোকজন আছে বলেই তো মনে হয় না। সাইকেলটা খুব বেশি ঝিকচিক চিকঝিক করছে; এবং মালিকও আঁশটে দুধরাজের মত ঝিকিয়ে উঠছে দোতলার ঘরে? সাইকেলের তালা খসিয়ে রাস্তায় নামিয়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে মাল্যবানের-এর মালিক যেন সন্ধ্যে না হতেই দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে বত্রিশ নম্বর বাড়িতেই উপস্থিত হয় তবু–ছায়া যেমন সারা দিন দেহের আগে–পিছে ছুটে নাগাল পায় না, রাতে অন্ধকারে শরীরের সেঙ্গ বিনিঃশেষে মিশে যায় তবু, তেমনি ভাবে এসে পড়ে অমরেশ; তেমনি ভাবে কোনো বত্রিশ, বত্রিশশ,–অনন্তের দিগন্তে চলে যাবে না কি মাল্যবান।

বত্রিশশ-অনন্তের দিগন্তে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলদিঘিতে বেড়াতে গেল; বেড়িয়ে যখন ফিরছে তখন প্রায় সাড়ে-নটা–এসে দেখে অমরেশের সাইকেল তখনো দেয়ালে কাত হয়ে রয়েছে।

'বাবু, আপনাকে ভাত এনে দিই?'

'কেন?'

'মা দিতে বলেছেন।'

'দাও।' মাল্যবান ঠাকুরকে বললে।

ভাত খেয়ে নিজের ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ পায়চারি করল সে, কিন্তু সাইকেল গেল না।

মনু বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে আছে। মাল্যবান ঘড়িতে দেখল প্রায় এগারটা বেজেছে; ওপরে গানবাজনা এক–আধবার দু–চার মিনিটের জন্যে তড়পে উঠে অতলে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন।

মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঢং করে একটা শব্দ হল, পাশের বাড়ির ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। এই বারে হয়ত ছেলেটি নেমে চলে যাবে।–কিন্তু, কই, নামল না তো সে। মাল্যবান ভাবল, গান–বাজনা আবার শুরু হবে হয়ত। কিন্তু, তাও তো হল না। যতক্ষণ গান সরোদ হাসিতামাশা চলছিল অন্ধকারে ঢিল মেরে নিজেকে তবুও খানিকটা ব্যস্ত রাখা চলে। কিন্তু সব থেমে গেছে তো এখন–বেশি রাত, বেশি অন্ধকার, বেশি শীত ঃ এখন কী? কী হচ্ছে এখন? যা হচ্ছে, তা হচ্ছে; মনের হেঁয়ালির কাছে মার খেয়ে কোন লাভ নেই। মনটাকে সে খুব হালকা করে নিল; যেন খুব মজাই হয়েছে ওপরের ঘরে, মনে করে হাসতে লাগল সে; সাইকেলটাকে মনে হল অমরেশের নেপালি বয়ের মত, সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে ভোজালির ঝলসানির মত; কোমরে ভোজালি গুঁজে অমরেশের নেপালি চাকরটা যেন বেশি রাতের নিরেট শীতে থুপ বুড়রি মত বসে আছে, মনিব ওপরের থেকে না নামলে রক্ষা নেই তার, কিছু নেই; কিন্তু তবুও একটা আশ্চর্য প্রতীকের মত যেন এই নেপালী ভোজালি–আজকের পৃথিবীর। স্ত্রী–পুরুষের সম্পর্ক, মানুষ–মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধ, সূক্ষ্মতা হারিফে ফেলেছে–সফলতাও সরলতাও; হারিয়ে ফেলেছে সরসতা; আজকের বিমূঢ় পৃথিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক–গ্রন্থিকে ছেদ করে অপরিমিত গণ্ডমূর্খের অপরিমেয় মনোবল পথ কেটে চলেছে একটা বোকা নেপালি ভোজালির মত। সময়কে প্রকৃতিকে পুরাণপুরুষকে (যদি থেকে থাকে কেউ) তবে কী হিসেবে ধ্যান করা যাবে আজ? প্রভু হিসেবে? সখা হিসেবে? পত্নী হিসেবে? না, তা নয়। স্বামী স্ত্রী বা সখা ভাবে নয়, সাধা হবে নেপালি ভোজালি ভাবে; ঘুম আসছে না মাল্যবানের।

মাল্যবানের নিজের দোষ নয়; ঘুমেরও দোষ নয়; এই পৃথিবীরই দোষ, শতাব্দীর দোষ; কিন্তু তবুও রাত তিনটের সময় জেগে উঠল যখন সে, তা হলে ঘুমিয়ে পড়েছিল কোনো এক সময়।

সাইকেলটা নেই ।

রাস্তার দিকের খোলা দরজা দিয়ে হু–হু করে শীত আসছে । উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল মাল্যবান ।

পরের দিন সন্ধ্যে রাতেই বেরিয়ে ফিরে মাল্যবান ঠাকুরের কাছে শুনল যে অমরেশবাবু ওপরে বৌঠাকুরুনের ঘরে ঢুকেছেন ।

মাল্যবান খেল–দেল, খবরের কাগজ পড়ল, চুরুট টানল; তার পর কথা ভাবল; সে ভাবতে–ভাবতে কথাই ভাবল দু–তিন ঘণ্টা ।

রাত বারটার সময় অমরেশ নীচে নেমে এল ।

'আপনি এখনও জেগে আছেন চাঁদমোহনবাবু–' মাল্যবানকে একটা হ্যাঁচকা ডাক দিয়ে লেপের নীচে আড়ষ্ট অবস্থার থেকে জাগিয়ে তুলে বললে, অমরেশ । মাল্যবানের নাম চাঁদমোহন নয় তো । অমরেশ একটু জিভ নেড়ে লাট মারতে চাইছে নামটা নিয়ে, সেই নামে মাল্যবানকে ডেকে । তা হোক । মাল্যবান মুখের থেকে লেপ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ।'

'তার পর?' সাইকেলের তালা খুলতে–খুলতে অমরেশ বললে ।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আহিরিটোলা ।'

'এত রাতে?'

'আহিরিটোলার গঙ্গায় নামতে হবে ।'

'এত রাতে?'

'সাঁতার কাটব ।'

মাল্যবান এবার আর–কিছু বললে না । বালিশে শিরদাঁড়াটা ঠেস দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসল ।

'সে আমাদের একটা দঙ্গল আছে । চার হাত পায়ে নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক–একটা সাঁতারু মুনিষ আহিরিটোলায় গঙ্গায় ।'

'মুনিষ' কেন বললে অমরেশ 'মানুষ' না বলে ভাবতে–ভাবতে মাল্যবান বললে, 'এত রাতে গঙ্গায় নাওয়া হবে?'

'নাওয়া না মশাই । গঙ্গামৃত্তিকার তেলক কাটবার জন্যে আমাদের জন্ম হয় নি, দাদা । সাঁতার–দেখি কে কত দূর যেতে পারে, কার আগে যেতে পারে–'

'ওঃ,' মাল্যবান বললে।

ছেলেটি সাইকেলটি খুলে রেখে মাল্যবানের টেবিলে এক কিনারে বসল।

'চেয়ারে বসুন।'

'এই বেশ বসেছি। আমাদের সাঁতার দেখতে যাবেন, চাঁদমোহনবাবু?'

'এখন? এত রাতে?'

'আচ্ছা, বেশ, বুড়োমানুষ আপনি, তা হলে বারুণী স্নানের সময় যাবেন। যখন গরম পড়ে যাবে।'

মাল্যবান বললে, 'কিন্তু সত্যিই কি আহিরিটোলার ঘাটে সাঁতার কাটা হবে আজ?'

'কী বলছি তবে আপনাকে। মেয়েরা অব্দি দেখতে যাবে—'নিজের ডান পায়ের কড়া পালিশের নিউকাট উঁচিয়ে নিয়ে অমরেশ বললে, 'এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বলছি ভদ্দরলোকের মেয়েরা যাবে সব দল বেঁধে আমাদের খেলা দেখতে, বেশ্যেরা যাবে, ওদিককার পাড়ায়—পাড়ায় যেখানে যত বেশ্যে আছে—'

মাল্যবান চুরুট জ্বালাল।

'রাঁড়েদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়েদের কোনো হামলা হবে না, সার্, কেউ কাউকে দূর—দূর বলে তাড়িয়ে দেবে না। এরাও যে মানুষ, ওরাও তা অকপটে স্বীকার করবে, সার্।'

মাল্যবান অবাক হয়ে ভাবছিল, এই সেই অমরেশ? একে নিয়ে উৎপলার রাত বারটা বাজে? থুতু না ছিটোলেও—কথা বলতে-বলতে জিভে-দাঁতে থুতু জমে যায় যাদের—সত্যি-সত্যি না অবিশ্যি, রূপক হিসেবে—সেই রকমই অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব তো এই ছেলেটি, চেহারা লম্বা; গড়নপেটন ভাল; মুখ সুন্দর পুরুষ মানুষের মত; এ সব বলে, ভুশি, হীরে হয়ে গেল উৎপলার কাছে। তাই তো হয়। সৃষ্টিটা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতন্ত্রী নয়, কী রকম মারাত্মক ভুল বিষের মতন মিশে রয়েছে নিখিলের রক্তের ভেতর, তার নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রণার প্রবাহের মধ্যে।

'কিন্তু, স্বীকার করলেই তো শুধু হবে না,' মাল্যবান বললে, 'ওদের মানুষ করবার পথ বাতলে দিতে হবে তো।'

'সে একটা মস্ত সামাজিক সমস্যার কথা হল—'

মাল্যবান চুরুট টানতে—টানতে বললে, 'সবই সব হল। তা বটে, সাঁতার কাটা দেখতে গিয়ে কি আর সামাজিক হেঁয়ালি মেটে। তবে হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা বেশ একটু ভ্রাতৃপ্রেম—ভগ্নীপ্রেম—ভাইব্রাদারি—কিন্তু ওদের তো ঢের খারাপ রোগ আছে।'

'আছে বটে, কিন্তু মেয়েরা তো রোগ দিতে পারে না। খুব হৃদ্যতার সঙ্গেই মেলামেশা, কিন্তু মেয়েরা তো পুরুষ নয়—'

'মাল্যবান মুখের দিকে চুরুটটা নামিয়ে কিছুক্ষণ চর্মচক্ষে এবং মনশ্চক্ষে–চার চোখ মিলিয়ে নিয়ে অমরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর বললে, 'ওখানে ছোকরাদের দলও তো বেশ ভারি।

'তাদের ভেতর দু–কানকাটা খুব কম।'

শুনে মাল্যবান ঘাড় বাঁকাল; ঘাড় সোজা করে চুরুট টেনে-টেনে ঘাড় বাঁকিয়ে অমরেশের দিকে তাকাল একবার। কিন্তু যে-কথাটি বলবে ভেবেছিলে তা বললে না, বাজে কথা পেড়ে মাল্যবান বললে, 'এত ঠাণ্ডায় সাঁতার কেটে নিমোনিয়া হবে না তো।'

'হবে–সেরে যাবে। না হয় মরে যাবে।'

'আরে কী বলে! মরে যাবার কী আছে! তা, আমার স্ত্রীকে কী করে চিনলেন?' মাল্যবান বেড়ালের চিতে বাঘ, চিতে বাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় আসা–যাওয়া করতে–করতে বললে।

'এখন চলি, মাল্যবানবাবু, রাত হয়ে গেছে।'

মাল্যবান চুরুটটা নিভে গিয়েছে টের পেল। দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে মাল্যবান একটা বড় হুড়াড়ের ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে বললে, 'সাইকেল এনে সটান যে ওপরে চলে গেলেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কবে কোথায় পরিচয় ছিল আপনার, বলবেন না?'

খুব সোজা কথা জিজ্ঞেস করেছে মাল্যবান, সহজ উত্তর, এক্ষুণি স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর না দিতে পারে যে অমরেশ তা নয়, কিন্তু তাবুও সে বললে, 'আমি আরও তো আসব আপনাদের এখানে। আর–একদিন না হয় বলব।' অমরেশ ওভারকোটের পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করল। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই যে সামাজিক সমস্যার কথা বলছিলেন, সেটার বিশেষ কিছুই করা যাবে না আমাদের সকলের আর্থিক জীবনের সুবিধে না এলে। এদিকে দিয়েই প্রথমে চেষ্টা করা দরকার। অবিশ্যি সমাজ ভাবনা সম্বন্ধে অন্ধ থাকলে চলবে না।'

মাল্যবান নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির নীচে অমরেশের কথাগুলো পুরনো নোংরা খবরের কাগজের মত চেপে রেখে দিয়ে বললে, 'আপনি নিজে তো খুব সচ্ছল–'

'আপনার স্ত্রীও তো খুব। দেখছি তো।' বলে অমরেশ যেন কোনো ইঙ্গি করে নি, কোনো খারাপ ইঙ্গিত করেই নি এমনই স্নিগ্ধ নির্দোষভাবে হাসল। কিন্তু হাসিটা কেটে গেল, অমরেশের মুখের চেহারা আরেক রকম যেন; অনুধাবন করে অস্পষ্টতার ভেতর থেকে তবুও কোনো স্পষ্টতা খুঁজে পেল না মাল্যবান, হাতের চুরুটের আগুন অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরটা নিস্তব্ধ হয়েছিল। দুজনের চুরুট, সিগারেটের ধোঁয়া, পরস্পরকে কাটাকাটি করে কথা বলছিল শুধু।

'আমার স্ত্রীটি তৃতীয় পক্ষের, আমার চেহারা দেখে তা মনে হয়, মাল্যবানবাবু?'

অমরেশ বললে, 'প্রথম পক্ষের স্ত্রীটি এখনো আছে, বাপের বাড়িতে থাকে, আমি তাকে নিয়ে ঘর করব না। দু–নম্বরের কাত্যায়নী মরে গেছে। এই তিন নম্বর। এ স্ত্রীর ছেলেপুলে তিনটি। আর–একটি এই মাঘে হচ্ছে।'

মাল্যবানের মনে হল অমরেশের গলার সুর, শরীরের বাঁধ, সমস্ত অন্তরাত্মার থেকেই কেমন–একটা সুদৃঢ় (কিন্তু) সুলভ আত্মতুষ্টি চুঁইয়ে পড়ছে। আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয় কিন্তু তবু উচ্ছৃঙ্খল–এই সব মূল্যবিশৃঙ্খলার পৃথিবীতে অমরেশের এই কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক; স্বাভাবিক অতএব ভাল; ভাল না মন্দ? সে নিজে কী রকম? মাল্যবান নিজের চুরুটের ছাইচাপা আগুনের এক আধটা কণিকার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। মূল্যবিশৃঙ্খলরা একেই শৃঙ্খলা মনে করে। মূল্যশৃঙ্খলা কী? কী জিনিস মাল্যবানের মতে? সে নিজে যদি মূল্যশৃঙ্খলা চায়, তা হলে তার নিজের বাড়িতেই সে জিনিস এ–রকম সুসদৃশ ভাবে অনুপস্থিত?

'রাত তো কম হয় নি।'

'বারটা বেজে গেছে।' অমরেশ বললে।

'শীতের রাত বারটা ... আমার স্ত্রীর কাছে কী দরকার ছিল আপনার?'

'কথা বলতে–বলতে রাত তো হবেই–'

'দেখছি তো হচ্ছে। এতদিন তো আপনাকে দেখি নি ওখানে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ধোঁয়া ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নেড়েচেড়ে নিয়ে অমরেশ বললে, 'আপনারা যে এখানে আছেন তা তো জানতুম না আমি।'

'কী করে জানতে পারলেন তবে?'

'চাঁদমোহনদা, চিনি তো পিঁপড়ের গন্ধ পায় না। পিঁপড়েকেই খুঁজে পেতে বার করতে হয়,' অমরেশ খুব উল্লাস বোধ করে বললে, 'আপনারা বেশ ঝাড়াঝাপটা থাকতে চান, ছোঁয়াছানা বাঁড়িয়ে খুব যা হোক; কিন্তু তা হয় না; পিঁপড়েতে চিনিতে ধুল পরিমাণ হয়ে যায়, চিনি পিঁপড়েকে বেছে খায়; দেখেছেন?'

মাল্যবানের মনে হচ্ছিল, অমরেশের কথার কোনো ঝাঁঝ নেই, যেন দুটো ঠ্যাঙের বদলে আটটা ঠ্যাং অমরেশের, মাকড়সার মত, কেমন ল্যাং–ল্যাং, ল্যাং–ল্যাং করছে সব সময়েই; কখনো গাঢ় সবুজ, কখনো গাঢ় লাল কামড়সানিদের দেখছে বলে–সমস্ত জীবনভরে। চেহারার চেকনাই আছে, টাকা আছে বলে বিগড়ে গেছে সে–অনেক মেয়ের হাতেই। উৎপলাও ইন্ধন দিচ্ছে?

মাল্যবান মুখের থেকে চুরুটটা নামিয়ে আন্দাজ করছিল ইন্ধন কতদূর–কী ধরনের–

ভাবতে–ভাবতে কেমন যেন সমাধিভূত হচ্ছিল; মুখে সে বলছিল, ‘বসুন, বসুন, অমরেশবাবু, বসুন।’ কিন্তু অনেকক্ষণ হল ঠোঁট–জিভ নাড়া স্তব্ধ করে দিয়েছিল তার মন নিমেষনিহত হয়েছিল; চুরুট নিভে গেছে–

‘চলি, মাল্যবানবাবু।’

‘আচ্ছা–’

‘কাল আসব।’

‘আসবেন। আসবেন।’

দিনসাতেক পরে রাত দশটার কিছু আগেই অমরেশ বেরিয়ে গেলে পরে মাল্যবান খাবার জন্যে ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে সে দেখল উৎপলা খাবার টেবিলের এক কিনারে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে; টেবিলের ওপর মাথা রেখে মনু ঘুমোচ্ছে।

‘আজকাল খেতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।’ মাল্যবান বললে।

‘কটা বেজেছে?’

‘দশটা।’

‘দশটা কি বেশি রাত?’

‘সকলের কাছে বেশি নয়,’ মাল্যবান বললে, ‘মনু তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি রাত হয়েছে বলে ঘুমোয় নি, খুব শীতে কাতরে ঘুমিয়েছে হয়ত।’

উৎপলা বললে, ‘তুমি তো আগে খেলেই পারো। রান্নাঘর তো তোমার নীচের ঘরের লাগাও। খাবার সময় মনুকে নিয়েও তো বসতে পারো–’

‘হ্যাঁ, কাল থেকে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। যে–লোকটি তোমার কাছে আজকাল খুব ঘন–ঘন আসছেন তাঁর জন্যেই খানিকটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়েছে পরিবারের ভেতর। ও কে?’

‘চিনি না।’

‘তার মানে?’

‘মানে যে–’

উৎপলার কথা কপচাবার ইচ্ছে ছিল না, বললে, ‘চিনি না। এই মানে। মানে–কোচড় ভরে নিয়ে যাও, চিবিয়ে খাও মানে। এই মনু! মনু! বলে ডাক পেড়ে উঠল উৎপলা।

'ওকে তুমি জাগিয়ো না, থাক–তুমি জাগিয়ো না ওকে।'

'খাবে না?'

'না।'

'রোজই তো না খেয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'ওকে এখন জাগিয়ে খাওয়াতে গেলে খাবে না কিছু, আমাদেরও খেতে দেবে না।' মাল্যবান মনুকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে এল।

উৎপলা একটা তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছে নিয়ে দুটো চিনেমাটির ডিশ, কাচের গেলাশ, একটা বড় পিরিচে নুন লেবু কাঁচালঙ্কা সাজিয়ে নিচ্ছিল। একটা পারুল ফুলের মত প্রকৃতির থেকেই যেন উৎপন্ন জমিনের তাঁতের শাড়ি সে পরেছিল–চওড়া লাল পাড়ের। আশাতিরিক্ত ভাবে পরিতৃপ্ত কেমন একজন সীতা, সরমা, দ্রৌপদী, চিত্রসেনীর মতন অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।

'এসো– খেতে এসো–' উৎপলা বললে।

মাল্যবান চেয়ারে বসে বললে 'অমরেশ কখন এসেছিল?'

'সন্ধ্যের সময়।'

'আমি অফিস থেকে ফেরবার আগেই?'

'তুমি কখন ফিরেছ, তা তো আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে ফিরেই ওর সাইকেলটা আমার ঘরে দেখলাম।'

'সাইকেলে আসে না কি?' উৎপলা বললে, 'জানি, না তো।'

'আজ রাত দশটার আগেই চলে গেল! এতদিন তো দেখলাম এগারটা–বারটা না বাজলে নড়েচড়ে না। কে লোকটা?'

'আমি চিনি না ওকে।'

উৎপলা খানসাতেক লুচি মাল্যবানের পাতে দিল, খান তিনেক নিজে নিল। দু–তিনটে বাটিতে বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, আর আলুর তরকারি ছিল। একটি সসপ্যানে দুধ ছিল–ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সবই মিইয়ে গেছে, লুচি কড়কড় করছে; কারুরই পেটে খিদে ছিল না যেন, কিন্তু তবুও এ–জিনিসের কিনার ভেঙে, ও–জিনিসটা খুঁটে, সে–জিনিসটা টিপে খুব গাফিলি গড়িমসি করে খেতে হচ্ছিল–খেতে খেতে দু–একটা কথা বলবার জন্যে থেমে পড়ছিল।

'চেনো না–তা হলে কী করে ও তোমার ঘরের ভেতর ঢোকে?'

'এটা আমার বাড়ি?'

মাল্যবান বললে, 'এতদিন তাই তো জেনে এসেছি। আজ অমরেশ এখানে আসছে যাচ্ছে বলে আমার ঘাড়ে মালিকানার বোঝা ঠেলে তুমি ওর গতিবিধির কৈফিয়ত আমার কাছ থেকেই নেবে ঠিক করেছ?'

উৎপলা তিনখানা লুচির আধখানা খেয়েছিল এতক্ষণে, বাকি আড়াইটে দিয়ে কী করবে ঠিক করতে না পেরে আপাতত হাত গুটিয়ে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি হোক, তোমার বাড়ি হোক, তোমার নাকের ওপর দিয়েই তো আমার ঘরে পাত্তা পাচ্ছে রোজ অমরেশ। কী করতে পেরেছ তুমি তার। কী করতে পারবে।'

মাল্যবান দুখানা লুচি শেষ করেছিল, কিছু ছোলার ডাল, একখানা বেগুনভাজা। জলের গেলাশে চুমুক মেরে ঠোঁট জিভ ভিজিয়ে দাঁত ঠাণ্ডা করে নিয়ে বললে, 'আমি তো জানতাম না যে ওকে তুমি চেনো না।'

'কী মনে করেছিলে তুমি?'

'ওকে তুমি চেনো না?'

'চিনি না বলছি তো।'

'তোমার বাপের বাড়ির কেউ না?'

'না।'

'কলেজে তোমার সঙ্গে পড়েছিল?'

'আমি তো মেয়েদের কলেজে পড়েছি–সেকেন্ড ইয়ার অব্দি। তুমি দিশে হারিয়ে ফেলছ।'

'কেউই না–কোনোদিনই দেখো নি ওকে এর আগে আর? স্তম্ভিত হয়ে মাল্যবান বললে, 'তবে?'

'তবে মানে?' ভ্রুকুটি করে উৎপলা মাল্যবানের দিকে তাকাল।

'তবে তোমার দিনের পর দিনই খুব খুলছে মনে হচ্ছে,' মাল্যবান কোমল–কঠিন চোখে উৎপলার দিকে তাকাল; কী একটা দাবি জানিয়ে অথচ তা প্রত্যাহার করে তাকিয়ে রইল অনড়, অক্লান্ত চোখে কিছুক্ষণ। বললে, 'ও আসার পর থেকেই তোমার চেহারার ভেতর এমন একটা সরম–সরসতা–যা আগে আমি দেখিনি বড় একটা। তোমার কথাবার্তা ব্যবহার বিয়ের জল পেয়েছিল কি একদিন? মেঘের জল পাচ্ছে কি আজ? এখনকারটাই তো ভাল মনে হচ্ছে।'

গড়িমসি করছিল এতক্ষণ, উৎপলা এবার খেতে শুরু করল। ঠোঁট একটু নড়ল কি নড়ল না, হাসি ফুটে উঠতে মিলিয়ে গেল মুখে, সে হাসিটা আমোদের–ব্যাথার–হয়ত গ্রন্থিমাংসপেশীর কেমন একটা অচেতন আক্ষেপের–

আধখানা লুচি খাওয়া হয়েছিল উৎপলার, বাকি আধখানা খাচ্ছিল।

'অমরেশ তো দিন পনের হল আমার কাছে আসছে। চার–পাঁচ–ছঘন্টা রাত কাটিয়ে যায়, বাতি জ্বলে ঘরে; বাতি নিভেও থাকে অনেকক্ষণ; আমরা মাঝে–মাঝে ভাবি তুমি হয়ত ওপরে আসছ; ওপরে এলে একটা কাণ্ডই বাধাতে তুমি–'লুচির বাকি টুকরোটুকু খেয়ে ফেলে উৎপলা বললে, 'তুমি বাধাতে কি না জানি না, তবে মানুষ তো মানুষ, ঝামেলা না হয়ে যায় না; বেধে যেত এত দিনে; অমরেশও চুপ করে থাকত না।'

'কেন কী হয় ওপরে?'

'আমি কেন তা বলব?'

'তা হলে পরের ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে যাব আমি?'

'কেন তুমি নিজে ওপরে এসে নিজের চোখে দেখে যেতে পারবে না? পনের দিন তো হল। নীচের থেকে তরতর করে লোকটাকে ওপরে উঠে যেতে দেখেছ তো রোজই। নীচের ঘরে বসে মাঝে–মাঝে কথাও বলেছে তোমার সঙ্গে। কথাবার্তা শুনে কেমন মনে হয়েছে অমরেশকে তোমার?'

মাল্যবান কিছু খেতে গেল না আর। এঁটো হাতে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'লুচি খেলে না যে–'

'খিদে নেই।'

'অমরেশ কাল আসবে।'

'আসেব বইকি,' উৎপলা আর–একখানা লুচির কিনার ভেঙে খিদে জাগিয়ে তুলবার সাহসিক চেষ্টায় নিজেকে আলোড়িত করে তুলে বললে, 'ওকে এ–বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিতে পারবে তুমি?'

উৎপলা উঠে দাঁড়াল।

'কী হল?'

'ঘুম পেয়েছে।'

'বসো, বসো, কথা আছে–'

'না, না, বসতে পারছি না, দুটো পায়ের গিঁটে ব্যাথা করছে। কী বলবে বলো, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি–'

মাল্যবান সিগারেটটা টানতে গেল না আর। জলের গেলাশের ভেতর সেটা ফেলে দিয়ে বললে, 'অমরেশের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবে বলো।'

উৎপলা নিজের জলের গেলাশটা মুখে নিয়ে খানিকটা জল খেল, বাকি কুলকুচো করে ছাদের দিকে ফেলে দিল। টেবিলে ছোট পিরিচে কয়েকটা পান ছিল। দুটো পান মুখে দিয়ে মাল্যবানের দিকে

বিলোড়িত–ক্রমে–ক্রমে শান্তিমণ্ডিত, কেমন একটা স্থির মমতায়, তাকিয়ে, হেসে বললে, ‘কোনো কিছু ব্যবস্থা করবার নেই ।’

‘কী বলছ তুমি!’ উৎপলার দৃষ্টিশক্তির ওপর একটা পাখসাট মেরে যেন মাল্যবান বললে, ‘খেয়াল আছে, কী বলছ তুমি!’

‘যা বলছি, তাই বলছি,’ তেমন দৃষ্টিতৃপ্তিতে মাল্যবানের দিকে তাকিয়ে একটু ঝক না মেরে উৎপলা বললে, ‘তুমি না–হয় কাল ওপরে এসে একটা বিহিত করে যেও–’

মাল্যবান উৎপলার মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে, মনের ঢের বেশি চোখের আলোকপাতের কড়া ঝাঁঝ দিয়ে, সমস্ত ঘরটা ভরে ফেলতে লাগল; ধীরে–ধীরে মনে আলো এল তার; দেখল আলোটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; মাল্যবান ভাবছিল, সে নিজে বিহিত কিছু করতে পারবে না; অন্ধকার রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে নিজের গাছেরও ফল চুরি করা বা যে চুরি করেছে তাকে ঠ্যাঙানো তার ধাতে নেই; ভাল হোক মন্দ হোক, কেমন একটা ধাত যেন তার; বন্ধুবান্ধব ডেকে হামলা করবার রুচি নেই; রটে যাবে সব, যেটুকু–বা সাংসারিক শান্তি আছে তাও ছটকে ছত্রিশখান হবে । কিন্তু উৎপলা কি তাকে সাহায্য করবে না?’

মাল্যবান গেলাশটার জল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোটার থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে নিজে ঢক–ঢক করে গিলে খেল–হাত–মুখ ধুয়ে ফেলল । ভাল লাগল, খানিকটা ঈশার শান্তি সংস্থাপিত হল পৃথিবীতে যেন, কিন্তু তুবও বিজ্ঞানের ঘোড়া ডিঙিয়ে সান্ত্বনার ঘাস খাবার প্রবৃত্তি মাল্যবানের ছিল না, সে ভেবে দেখল, উৎপলা আর অমরেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে যা সন্দেহ করেছে স্বামীর চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলে–আজকালকার পৃথিবী যা তাতে আটাশ বছরের রূপসী শঙ্খিনী স্ত্রী সম্পর্কে সে রকম সন্দেহ না সে করতে পারে যে তা নয় । কিন্তু উৎপলা মোটেই সে জাতের মেয়ে নয়, তাকে অবিশ্বাস করা ঠিক নয় । অমরেশ আসে রোজই বটে, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায়, কিন্তু ওরা বোন–ভাইয়ের মত; বড় জোর জামাই–শালীর মত সম্বন্ধ ওদের, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়–জীবনের সৎ ও অসৎকে নিয়ে মাল্যবানের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ঘিরে মাক্রোপোলো সিগারেটের নীল ধূসর ধোঁয়ার নীলাঞ্জন মাল্যবানকে কেমন একটা আশ্চর্য নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিপ্রীত করে রেখে দিল, কোনো কথা ভাববার দরকার বোধ করল না সে আর ।

‘অমরেশের খুব টাকা আছে?’

‘না । বিশেষ কিছু নেই ।’

‘তবে, আমাদের চেয়ে বড়লোক ।’

উৎপলা অত্যন্ত ছাড়া–ছাড়া গা–ছাড়া ভাবে বললে, ‘বলতে পারছি না । তা হতে পারে ।’

‘দেখে তো মনে হয় বনেদি ঘরের ছেলে ।’

উৎপলা টেবিলের ও–কিনারে দাঁড়িয়েছিল, এ–কিনারে এসেছিল, কখন ও–দিককার কিনারে চলে গিয়েছে আবার, দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে ছিল, বসছিল না, বললে, 'ও, তুমি, কেবল টাকা আর বংশের কথাই ভাবছ। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না। ওদের খুব বড় জমিদারি ছিল, অনেক শরিক হয়ে পড়েছে। জমিদারিতে ভাঙন ধরেছে–এখন বিশেষ কিছু নেই–'

'বয়স কত অমরেশের?'

'এই ছত্রিশ–সাঁতাইত্রিশ হবে–'

'স্ত্রী কেমন?'

'সেকেল জমিদারদের যে–রকম হয়–' যেন বার্তা বহন করেছে, আর–কিছু নয়, শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনতায় উৎপলা বললে, এক–আধ ফোঁটা রক্তকণিকায় তবু নিজেকে, নিজের কথাকে চারদিককার শীত রাতের আবহকে কেমন একটা বর্তাতীততা দান করে।

'ও তো সেকেলে নয়–ও তো এখনকার–'

'হ্যাঁ, ও নিজে মনে ভাবে যে ও আগামী যুগের,' উৎপলা ঢিলে হাসি হেসে খানিকটা গ্রন্থিমাংসপেশীর আক্ষেপে কেঁপে উঠে, অবিশ্বাসে, অথচ শিশুকে প্রশ্রয় দেবার মত একটা হতবল অকপট হাসিতে কাতর হয়ে উঠে বললে, 'ওর মাথায় অনেক বিদ্যে। কিন্তু ওর পারিবারটা ওকে পিছে টানছে, ওর ছেলেপিলে তিনটে, এই মাঘে আর–একটি হবে?'

'এত কথা তুমি জানতে পেরেছ,' অন্ধকারের ভেতর কেউটের মত নড়ছে একটা মহিষের লেজ, তার মুখোমুখি যেন এসে পড়ে বললে মাল্যবান।

উৎপলা পানের পিরিচের থেকে একটা পান তুলে নিয়ে অন্যমনষ্কভাবে রেখে দিল আবার। পিরিচে মশলা ছিল। আঙুল দিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে–ঘুরিয়ে ঘেঁটে একটা লবঙ্গ তুলে নিল। লবঙ্গটা দাঁত দিয়ে কাটতে–কাটতে বললে, 'অমরেশ তো আমার এখানে রোজ আসে। আমার এখানে অনেক রাত অব্দি থাকে। সব কথাই বলে আমাকে। কেন জানতে পারব না সব?

মত কী রকম উম আমাদের দুজনের। আবার দেখবে কী রকম লম্বা এ–সব রাত।

মাল্যবান চিতাবাঘের মত মুখ খিঁচোতে গিয়ে গৃহবলিভুকের মত ক্লান্ত ক্লিষ্ট চোখে বললে, 'ও কি নিজেই সব বলে– সব করে? তুমিই কি ওকে দিয়ে বলাচ্ছ। রাত বারটা–একটা অব্দি ও এখানে থাকে–তুমি আছ, তাই, তুমি ওকে থাকতে দিচ্ছ বলে। এর কোনো বিহিত করবে না?

'এর কোন বিহিত নেই।'

'নেই। কোনো নালিশ করো না তুমি।

উৎপলা অন্তর্ভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে মাল্যবানের দিকে তাকাল, এমন মমতার সঙ্গে তাকাল–ভালবাসার এমন গভীর আবেশ!–মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে তাকিয়েছিল–তাকাতে–তাকাতে তাকাতে পারল না সে আর।

'শোনো।'

মাল্যবান উৎপলার চোখের দিকে ফিরে তাকাল আবার। কিন্তু তাকিয়েই রইল সে। উৎপলাও মাল্যবানের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। দু–জনেরই খুব ভাল লাগল। কিন্তু এ তো পরলোকে এঁয়োতি নিবিড়তা–জীবন–নদীর ওপারে–হয়ত হবে কোনোদিন–হয়ত হবে না।

'বলো।'

'বলেছিই তো।' বললে উৎপলা।

'অমরেশের মতন একটা অচ্ছুৎ–'

'অচ্ছুৎ মানে? ও তো বামুনের ছেলে–'

'বেশ্যাটা এখনও আসবে তোমার কাছে?'

'তুমি বড় বিশ্রী কথা বল,' কোথাও আগুন নেই, যেন ছাই-এর ভেতর, তবুও সর্বব্যাপ্ত আঁচ রয়েছে সেই নিশ্চল উনুনের মত তাপ ছড়িয়ে উৎপলা বললে। শীতের রাতে তাপটা খারাপ লাগছিল না মাল্যবানের। উৎপলা দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে তাপ বিকিরণ করে কোনো–একটা অপরিচিত অন্যতম কুহর থেকে তাপ সঞ্চয় করে বললে, 'ও তো দশটা–এগারটা অব্দি থাকে। এখন দুটো। শীতের রাতটা পেকেছে এখন–'

'পেকেছে?' উৎপলার ইচ্ছুক অনুগত শরীরের দিকে তাকিয়ে মাল্যবান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'কাকে বলে পাকা শীত রাত?'

'এই তো এই সময়টা–'

'কিন্তু, এই সময়টা তো সব সময় থাকবে না, ভেঙে যাবে তো সব কালকে ভোরবেলা।'

'ভোর হবে না আর।'

'কী করে বলছ তুমি?'

মাল্যবান উঠে দাঁড়াল। স্লিপারের ভেতর গা গলিয়ে গায়ের চাদর আঁট করে নিয়ে ঘরের চারদিকের অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতেই দেখল উৎপলা তার আরো অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুজনে বিছনায় শুল গিয়ে। উৎপলা মাল্যবানকে বললে, 'ভোর হবে না আর, জানতে হবে না। দেখো শীতের রাত কী রকম শীত, খড়ের বিছানায় হাঁস–হাঁসিনের শীতের রাত সত্যিই কী যে চমৎকার লম্বা বলে আরো ভাল। সত্যি, কোনোদিন শেষ হবে না আর।'

মাল্যবানের আশ্চর্য লাগছিল। কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর, শীত, যা সব চেয়ে ভাল, এই বিশৃঙ্খলা অধঃপতিত সময়ে সমাজে রাতের বিছানা, যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই শীত রাতের কোনোদিন শেষ হবে না আর, উৎপলা সব সময়ই মাল্যবানের সময় ঘেঁষে থেকে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুর ভেতর। এই সব অপরূপ লাগল তার। কিন্তু তবুও কী করে তা হয়? ইতিহাস নেই? বিভেদ করে চলে যেতে দিয়েছে মাল্যবানকে নিয়ে উৎপলাকে? সময় তো আছে? সময় নেই? ছেদ করে চলে গেছে, তাকে নিয়ে, সকল সময়কে উৎপলাকে? গভীর গভীর এই শীতের রাত। অনির্বচনীয়–যখন নদীর থেকে নয়, শুকনো শক্ত চুনি–পান্নার ভেতর থেকে জল ঝরছে; সেই জলদেবীকে নিয়ে এ–রকম শীতের রাতে শুয়ে থাকা।

কোনোনোদিন শেষ হবে না রাতের?

না।

কোনোদিন শেষ হবে না আমাদের রাতের, উৎপলা?

হবে না। হবে না।

শীতের রাত ফুরুবে না কোনোদিন?

না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত আমাদের ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

না, না, ফুরুবে না।

কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?

ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন–

আলোড়িত হয়ে কথা বলতে–বলতে কেমন আলো–অন্ধকার, সূর্য, শিকরে বাজ, বড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল শুনতে–শুনতে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে। তাকিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার; টেবিলের থালা বাসন সমস্ত সরিয়ে এঁটো পরিষ্কার করা হয়েছে কখন যে সে তা টেরও পায়নি;

টেবিল ফিটফাট পরিচ্ছন্ন–কাল সরীসৃপের পিঠের মত চকচক করছে। মাল্যবান বুঝতে পারছিল না কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই যে এই মাত্র উৎপলাকে দেখছিল, বিছানায় শুয়েছিল, কথা শুনছিল–এ সব তা হলে ঘুমের ভেতর দেখা, নির্জ্জান পরলোকের কণ্ঠে শোনা? জেগে থেকে তা হলে সে কোন অব্দি শুনেছিল। মাল্যবান ঘাড় হেঁট করে অন্ধকারে বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল।...

মনে পড়ল তার। মনটা তার বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছু হবে না, কিছু সে করতে পারবে না বলে উৎপলা তার পর মাল্যবানকে এঁটো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়তে দেখল; এঁটো পরিষ্কার করল; মশারি ফেলল; বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল,–কিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত মনে করল না?